Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 98 – 118
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' ও নরেশচন্দ্রর 'ঠানদিদি' প্রসঙ্গে

ইন্দ্রাণী রুজ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
ইমেইল : indranirooj75@gmail.com

Keyword
নষ্টনীড়, ঠানদিদি, রবীন্দ্র-বিদূষণ, সাহিত্যিক প্রতর্ক, অশ্লীলতা, যৌনতা, মনস্তত্ত্ব, সমালোচনা।

Abstract
বাংলা সমালোচনা সাহিত্য ও বিদ্যাতনিক পরিসরে রবীন্দ্রনাথ একটি অত্যন্ত চর্চিত বিষয়। সুতরাং, তাঁর 'নষ্টনীড়' গল্পটির আলোচনা অপ্রতুল নয়। ১৯৬৪ সালের পর তা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষিত হয়েছে। কিন্তু প্রায় সমসময়ে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত একই বিষয় নিয়ে 'নারায়ণ' পত্রিকায় লেখেন 'ঠানদিদি' গল্পটি। অথচ এটি ততখানি আলোচিত নয়। কেউ কেউ অবশ্য একে বলতে চেয়েছেন 'নষ্টনীড়'-এর পরিপূরক একটি গল্প। আসলে কি তাই? এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের সঙ্গে নরেশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের গল্পসূত্রে শুধু দুই সাহিত্যিকের শিল্প-সাহিত্য দর্শন নয়, উঠে এসেছে রবীন্দ্রনাথ-নরেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক বিতর্ক প্রসঙ্গটিও। বাংলা সমালোচনার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের প্রেক্ষাপটে দুটি গল্পের অবস্থান সাপেক্ষে সূচিত হয়েছে পর্বান্তর। 'নষ্টনীড়' ও 'ঠানদিদি'র নিহিত বিশ্লেষণ সূত্রে সমাজ ও সাহিত্য সম্পর্কিত সামগ্রিক বীক্ষা উপস্থাপিত হয়েছে এই প্রবন্ধে – যা ইতিপূর্বে অনালোচিত ছিল।

Discussion

১

রবীন্দ্রনাথের সমসময়ে রবীন্দ্র-স্তুতির সমান্তরালে রবীন্দ্র-বিদূষণের একটি দীর্ঘ ইতিবৃত্ত রয়েছে; যা ইতিমধ্যে চর্চিত একটি বিষয়। রবীন্দ্র-পরিকরবৃন্দ কিংবা রবীন্দ্র সাহিত্য - গুণমুগ্ধদের সঙ্গে রবীন্দ্র-বিরোধী বা আরও সুনির্দিষ্ট ভাবে রবীন্দ্রবলয়-বহির্ভূত সাহিত্যিকগোষ্ঠীর বিভিন্ন সময়ে সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা, শ্লীলতা-অশ্লীলতা, সাধু-চলিত ভাষা, সাহিত্যের ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে মতাদর্শগত অনৈক্য ও সাহিত্যশিল্প-সম্বন্ধীয় প্রতর্ক ঘটেছে। সেই আদর্শগত বিরোধের মাধ্যমে ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠেছে প্রাচীনপন্থী-নবীনপন্থী, কলাকৈবল্যবাদী-প্রকৃতিবাদী, ভাববাদী-বস্তুবাদী দ্বন্দ্ব। প্যারোডি (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'লালিকা') কবিতা-গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, চিঠিপত্র, প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে কখনও যুক্তিযুক্ত গঠনমূলক, কখনও বা অযৌক্তিক আক্রমণাত্মক বাগ্‌বিতণ্ডায় 'জ্যোতির্ময় রবি'-কে আবিল করে তুলেছে 'কালো মেঘের দল'। তাঁর সমকালে

বিরোধিতাকে অতিক্রম করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমালোচকগণ ব্যাপৃত হয়েছেন রবীন্দ্র-বিদূষণে। আবার রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করে রবীন্দ্র-আবেষ্টনীর বাইরে এসে সচেতনভাবে নতুন ধরনের সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস করেছেন রবীন্দ্রত্তোর একদল তরুণ লেখক; সূচিত করেছেন রবীন্দ্রযুগ অতিক্রান্ত 'কল্লোল যুগ'।

ফলে একদিকে যেমন 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, একদা 'হিতবাদী'-র সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, মহেন্দ্রনাথ রায়, খগেন্দ্রনাথ চাটুজ্যে, চন্দ্রনাথ বসু, নিত্যকৃষ্ণ বসু, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অমরেন্দ্রনাথ রায়, গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল থেকে শুরু করে 'কল্লোল'-'উত্তরা'-'কালি-কলম'-'প্রগতি' পত্রিকা, পরবর্তী সময়ে 'অবতার' পত্রিকাসহ বিভিন্ন খ্যাত-অখ্যাত পত্রিকাগোষ্ঠী অথবা ব্যক্তিত্ব সময়বিশেষে ব্যঙ্গাত্মক-আক্রমণাত্মক-যুক্তিপূর্ণ রচনা দ্বারা রবীন্দ্র-সাহিত্য এমনকি ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথেরও বিরুদ্ধাচরণ করেছেন; অপরপক্ষে দীনেশচরণ বসু, রমণীমোহন ঘোষ, কৈলাসচন্দ্র সিংহ, প্রিয়নাথ সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, প্রমথ চৌধুরী, প্রফুল্লময়ী দেবী, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল হোম, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এমনকি 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত দাস প্রমুখ রবীন্দ্রানুগামী ব্যক্তিত্ব এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'সপ্তাশ্ববাহিত রবি'[১] হয়ে এই আক্রমণ যথোপযোগী উপায়ে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছেন। কোনও ক্ষেত্রে সাময়িক মতান্তর অন্ত্যে ব্যক্তিগত বিরোধের অবসান ঘটেছে, আবার কোথাও সম্পর্ক শীতলতায় পর্যবসিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সমকালীন বিবিধ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান নির্বিশেষে এ-কথা প্রযোজ্য।

প্রসঙ্গত, প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে এই সমালোচনা ধারায় রবীন্দ্র - বিরোধিতার একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত 'সবুজ পত্র' পত্রিকা বনাম 'নারায়ণ' পত্রিকার দ্বৈরথ। ১৩২১ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ (৭ মে, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ) রবীন্দ্রনাথের ৫৪তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে মূলত তাঁর লেখনীকে সম্বল করে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল 'সবুজ পত্র'। প্রবন্ধধর্মী এই পত্রিকার নিজস্ব লেখকগোষ্ঠী অর্থাৎ 'সবুজ সভা'র সদস্যদের লেখনী, পত্রিকার চলিত ভাষার সপক্ষে সওয়াল ইত্যাদি কার্যকলাপের জন্য 'সবুজতন্ত্রের পুরোহিত' রবীন্দ্রনাথের উপর আক্রমণকে আরও শাণিত করতেই ওই একই বছর কয়েকমাস পর, অগ্রহায়ণ ১৩২১ সালে (২০ নভেম্বর, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ) চিত্তরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় রবীন্দ্র-বিরোধীগোষ্ঠীর নারায়ণী অস্ত্র 'নারায়ণ' পত্রিকা। সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দাশ হলেও পত্রিকার যাবতীয় কর্মকৃতি সম্পাদিত হতো বিপিনচন্দ্র পালের প্রণোদনায়। 'নারায়ণ' পত্রিকা মেজাজে-ধর্মে 'সবুজ পত্র'-এর সম্পূর্ণ বিপরীত গোত্রীয়, 'অতিমাত্রায় সংরক্ষণবাদী' একটি পত্রিকা। 'সবুজ পত্র' তথা রবীন্দ্র-বিরোধ সূত্রে এর অভ্যুদয়। পত্রিকার প্রথম সংখ্যার রচনাসূচি লক্ষ করলেই তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অগ্রহায়ণ ১৩২১-এ আনুষঙ্গিক আটটি লেখার সঙ্গে লেখকের নামবিহীন একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটির নাম 'মৃণালের কথা'। বিপিনচন্দ্র পালের লেখা এই গল্পটি 'সবুজ পত্র' পত্রিকার ১৩২১ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের ব্যঙ্গাত্মক জবাব। রবীন্দ্র-সমালোচনার প্রেক্ষাপটে গল্পদুটির তুলনামূলক আলোচনা ইতিপূর্বে গবেষকগণ করেছেন এবং পাঠকমাত্রেই জানেন সাহিত্যমূল্য কিংবা অন্যান্য সাহিত্য-সাপেক্ষ অনুষঙ্গকে বাদ দিলেও আসলে এই ধরনের সমালোচনা কিংবা প্যারোডি-ধর্মী রচনার উৎস ও মূলগত অভিপ্রায়টি হল স্ত্রী-স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিষয়ে মতাদর্শগত অনৈক্য প্রদর্শন এবং রক্ষণশীলের সংস্কারাচ্ছন্ন পশ্চাদপশরণ।

> "কেননা বিপিনচন্দ্রের মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ঐ গল্পে নারী প্রগতির যে ছবি আছে তা অবাস্তব এবং বিলিতি সমাজের ধার করা জিনিস।"[২]

ফলে 'মৃণালের কথা' ছিল তাঁর 'শ্লেষাত্মক পত্রাঘাত'। এই ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেই 'নারায়ণ' পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র পালের হরিদাস ভারতী ছদ্মনামে রচিত 'কল্যাণী', ক্ষেত্রলাল সাহা রচিত 'মোহিনী' প্রভৃতি গল্পে হিন্দু রক্ষণশীল জীবনাদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে। শুধু তাই-ই নয়, 'গজদন্তমিনারে আশ্রিত', 'অভিজাত কুলশীল ও পরিবেশ'-এ লালিত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতার অভাব নিয়ে বিপিনচন্দ্রের অভিযোগের সূত্রপাত এই 'সবুজ পত্র'-'নারায়ণ' পর্বেরও পূর্বে। 'নারায়ণ' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা-উত্তর তা আরও বিস্তার পায় এবং 'সবুজ সভা' ও নারায়ণী সেনাদের যুক্তি-প্রতিযুক্তির মধ্য দিয়ে এই পর্বের আপাত অবসান ঘটে।

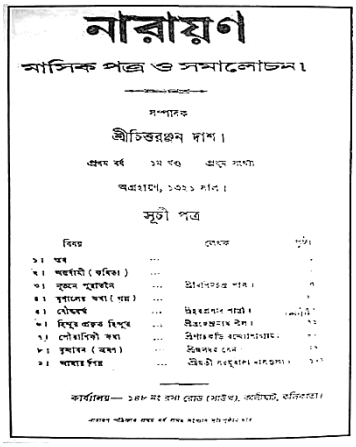

নারায়ণ
মাসিক পত্র ও সমালোচনা।
সম্পাদক
শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।
প্রথম বর্ষ ১ম খণ্ড প্রথম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ, ১৩২১ সাল।
সূচী পত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। স্তব		
২। অন্তর্যামী (কবিতা)		
৩। নূতনে পুরাতনে	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।	
৪। মৃণালের কথা (গল্প)		
৫। বৌদ্ধধর্ম	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।	
৬। বিন্দুতে প্রকৃত বিন্দুর	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল।	
৭। পৌরাণিকী কথা	শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।	
৮। বৃন্দাবন (ভ্রমণ)	শ্রীজলধর সেন।	
৯। আমার পিয়া	শ্রীমতী সরযূবালা দাশগুপ্তা।	

কার্যালয়— ১৪৮ নং রসা রোড (সাউথ), কালীঘাট, কলিকাতা।

নারায়ণ পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সূচিপত্র

এহেন 'নারায়ণ' পত্রিকারই একজন অন্যতম সেনানী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। সফল আইনজ্ঞ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তর (১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ – ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ) বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব শরৎচন্দ্রর উত্তরসূরী এবং কল্লোলপন্থীদের অগ্রজ হিসেবে। বস্তুত, প্রাক্-কল্লোল যুগের এই লেখক-

> "দৃষ্টিভঙ্গির 'আধুনিকতা'য় শরৎচন্দ্রকেও অতিক্রম করে গেলেন। শরৎচন্দ্রের চেয়ে অনেক বেশি উগ্র, আতিশয্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নরেশচন্দ্রের।"[৩]

তাঁর এই উগ্র-আতিশয্যমূলক দৃষ্টি মূলত 'যৌবনরাগ' আশ্রিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জটিল জীবন ও সমাজের বাস্তবধর্মী প্রেক্ষাপট থেকে উঠে আসা তাঁর রচনাগুলিতে নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে মিথুনাসক্তি। স্বভাবতই 'মিথুন প্রবৃত্তির পৌনঃপুন্য'[৪] নিয়ে পরবর্তীকালে যাঁদের বিরুদ্ধে 'যৌন-কল্লোল'[৫] তোলার অভিযোগ তীব্র রূপ পরিগ্রহ করে, যুগপৎ ঘনিয়ে ওঠে 'জনপ্রিয়তা ও জনবিরুদ্ধতার প্রবল ঘূর্ণী' – সেই 'কল্লোল'-'কালি-কলম'- 'প্রগতি'-'উত্তরা'র তরুণ লেখকদের কাছে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ছিলেন অগ্রজপ্রতিম। এই নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত রচিত 'ঠানদিদি' গল্পটির পরিপার্শ্বে রবীন্দ্রনাথের বহুল আলোচিত গল্প 'নষ্টনীড়'-এর তুলনামূলক একটি পর্যালোচনা আমাদের অন্বিষ্ট। বাহ্যিকভাবে 'thematic' মিল থাকলেও গল্পদ্বয়ের তন্নিষ্ঠ পাঠ থেকে আমরা বোঝার চেষ্টা করব, এদের মধ্যে কোনও সম্পর্ক রয়েছে কিনা থাকলে তার মূলগত ভিত্তি কী? বিশেষত, গল্পদুটির সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য ও তার তাৎপর্য নির্ধারণ করা আমাদের এই নিবন্ধের মূলগত অভিপ্রায়।

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, পূর্বোক্ত যে দুটি গল্প অর্থাৎ 'স্ত্রীর পত্র' ও 'মৃণালের কথা'র বিতর্ক অনুষঙ্গ আমাদের আলোচনায় উত্থাপিত হয়েছে, সে-দুটির সম্পর্ক ছিল প্রত্যক্ষ। বস্তুত গল্পদুটির অন্তর্বর্তী সময়ের ব্যবধান স্বল্প এবং চরিত্র-পাত্রর সঙ্গে সাদৃশ্যও বিশদ। আমরা বলতে চাইছি, বিরোধিতা কিংবা বিতর্কের ক্ষেত্রটি সেখানে ঘোষণা-পূর্বক সুস্পষ্টরূপে পরিদৃশ্যমান। এই মানদণ্ডে বিচার করলে আপাতভাবে 'নষ্টনীড়' ও 'ঠানদিদি'র সে-রকম কোনও প্রত্যক্ষ যোগসূত্র নেই, অথচ দুটি গল্প যে পুরোমাত্রায় সম্পর্কহীন এমন নয়। ফলত সেই সূত্রগুলিকে পর্যালোচনা করে আমাদের বক্তব্যকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলতে, বিশেষভাবে একই বিষয়ভিত্তিক বিবিধ গল্প যখন সমসময় বা তার অব্যবহিত সময় পূর্বে অথবা পরে বিদ্যমান তখন কেন এই দুটি গল্পের তুলনামূলক আলোচনাকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি তার একটি প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা দেওয়া আবশ্যক। ফলশ্রুতিতে আমাদের এই নিবন্ধের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ-নরেশচন্দ্র সম্পর্কসূত্রটিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হবে।

২

শ্লীলতা-অশ্লীলতা, নীতি-দুর্নীতি এ-জাতীয় সাহিত্যের ধর্ম সংক্রান্ত বিবিধ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই অভিযোগ যে কল্লোল যুগবাহিত এমন নয়। ইতিপূর্বে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', ভারতচন্দ্রর 'অন্নদামঙ্গল'-কাব্যের 'বিদ্যাসুন্দর' থেকে শুরু করে বটতলার আদিরসাত্মক সাহিত্যসমূহ বারংবার অশ্লীলতা-দুর্নীতির অভিযোগে

অভিযুক্ত হয়েছে। উনিশ শতকীয় শিষ্ট সাহিত্যসমাজ এ-জাতীয় বিতর্কে মুখর থেকেছে, ব্রিটিশ প্রশাসকের বদান্যতায় প্রণয়ন করা হয়েছে আইন। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রর 'বিষবৃক্ষ', 'আনন্দমঠ'[৬] সহ রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি', 'ঘরে-বাইরে', আলোচ্য 'নষ্টনীড়'ও সমাজবহির্ভূত সম্পর্ক কিংবা নীতি লঙ্ঘনের জন্য কটাক্ষের শিকার হয়েছে। অথচ পরবর্তীকালে 'কল্লোল পর্বে'র লেখকগণ পুনরায় একই অভিযোগে অভিযুক্ত হলেন এবং এই অভিযোগ অনেকবেশি তীব্র, কিছুক্ষেত্রে তা আদালত পর্যন্তও অগ্রসর হয়। এই সামগ্রিক তর্ক-বিতর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন নরেশচন্দ্র এবং অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। যেহেতু তখন অর্থাৎ বিশ শতকের প্রারম্ভকালীন পর্বে বাংলা সাহিত্য পরিমণ্ডলে রবীন্দ্রনাথ অবিসংবাদী একজন ব্যক্তিত্ব, সেহেতু সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে তিনি সহজাতভাবেই চলে এসেছেন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। তাঁকে সাহিত্যের সর্বোচ্চ আদালতে বিচারপতির ভূমিকায় আসীন করে এই বিতর্কটিকে তরান্বিত করেছিলেন সজনীকান্ত দাস তাঁর 'শনিবারের চিঠি'র মাধ্যমে।

যদিও আলোচ্য গল্পদুটির প্রকাশ ইতিপূর্বে ঘটে গেছিল। 'নষ্টনীড়' প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতী' পত্রিকায়। যে পত্রিকার পরিকল্পক ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশিষ্ট সমালোচক লিখেছেন,

"ভারতী'ই রবীন্দ্র-ভারতীর প্রথম পদ্মাসন।"[৭]

ইতিহাস সূত্রে মনে করা হয়, "... রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, এই দুই কবির বিহঙ্গের নীড় রচনার উদ্দেশ্যে 'বঙ্গদর্শনের' মত ভারতীর জন্ম হয়।"[৮] বস্তুত, ১২৮৪ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সেই ভাবধারাকে নবরূপ প্রদান-কল্পে ঠাকুরবাড়ির বিত্তবান সন্তানদের পরিচালনায় ও আর্থিক আনুকূল্যে ১৫ শ্রাবণ ১২৮৪ সালে (২৯ জুলাই, ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ) 'ভারতী'র আত্মপ্রকাশ। বিভিন্ন সময়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ (১২৮৪ শ্রাবণ – ১২৯০), স্বর্ণকুমারী দেবী (১২৯১ – ১৩০১), হিরন্ময়ী ও সরলা দেবী (যুগ্ম ভাবে, ১৩০২ – ১৩০৪), রবীন্দ্রনাথ (১৩০৫), মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (যুগ্ম ভাবে, ১৩২২ – ১৩৩০) এবং স্বর্ণকুমারী দেবী (১৩১৫ – ১৩২১) ও সরলা দেবী (১৩০৬ – ১৩১৪, ১৩৩১ – কার্তিক, ১৩৩৩) এককভাবে একাধিকবার 'ভারতী'র সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। সরলা দেবীর সম্পাদনাকালে 'ভারতী'-তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'নষ্টনীড়'। উল্লেখ্য, 'ভারতী'তে এটি প্রকাশিত হয়েছিল উপন্যাস হিসেবে। যদিও 'নষ্টনীড়'-কে গল্প কিংবা উপন্যাস কোন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হবে তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা ছিল। 'গল্পগুচ্ছ' গ্রন্থে 'নষ্টনীড়' গল্প হিসেবে মুদ্রিত হলেও ১৩১১ সালে প্রকাশিত 'হিতবাদির উপহার। রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী।'-তে 'নষ্ট নীড়'-কে রাখা হয়েছিল উপন্যাস বিভাগে।[৯]

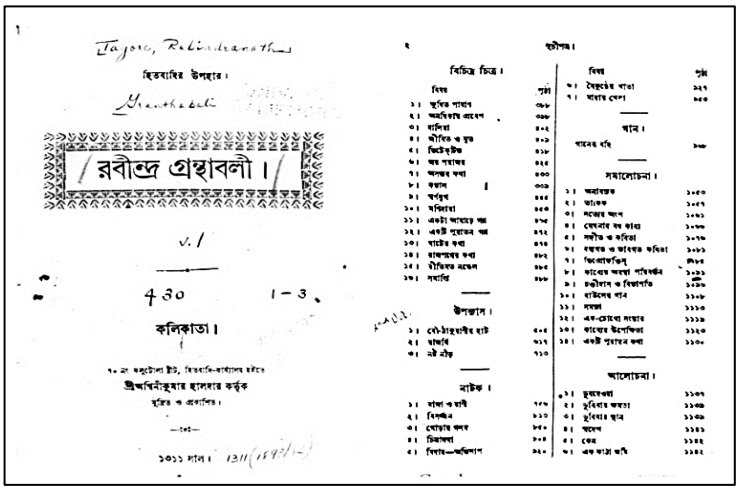

এখানে যথাক্রমে রয়েছে রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর প্রচ্ছদ এবং সূচিপত্রর দ্বিতীয় পৃষ্ঠা; যেখানে উপন্যাস বিভাগে মুদ্রিত হয়েছে 'নষ্ট নীড়'

'নষ্টনীড়'-এর ধারাবাহিক প্রকাশের ক্রমটি নিম্নরূপ –

প্রথম পরিচ্ছেদ : ২৫ বর্ষ, বৈশাখ ১৩০৮, পৃষ্ঠা ৯৯-১০৮
দ্বিতীয় – চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ২৫ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮, পৃষ্ঠা ১৮৯-২০৪
পঞ্চম – অষ্টম পরিচ্ছেদ : ২৫ বর্ষ, আষাঢ় ১৩০৮, পৃষ্ঠা ২৯৫-৩১১
নবম – দশম পরিচ্ছেদ : ২৫ বর্ষ, শ্রাবণ ১৩০৮, পৃষ্ঠা ৪০৩-০৯
একাদশ – দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : ২৫ বর্ষ, ভাদ্র ১৩০৮, পৃষ্ঠা ৫২৫-৩২
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : ২৫ বর্ষ, আশ্বিন ১৩০৮, পৃষ্ঠা ৫৬২-৬৫
চতুর্দশ – ষোড়শ পরিচ্ছেদ : ২৫ বর্ষ, কার্তিক ১৩০৮, পৃষ্ঠা ১০৫-১২
সপ্তদশ – বিংশ পরিচ্ছেদ : ২৫ বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩০৮, পৃষ্ঠা ১৯১-২০০

অন্যদিকে, এরই সমান্তরালে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত হয়েছিল "বাংলা সাহিত্যে প্রথম সমাজ-জীবনাশ্রিত মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ-মূলক সমস্যানিষ্ঠ উপন্যাস"[১০] 'চোখের বালি' (বৈশাখ ১৩০৮ – কার্তিক ১৩০৯)। "দুইয়েরই ধর্ম এক; কাঠামো এবং আশ্রয় ভিন্ন।"[১১] অর্থাৎ, দুটি ক্ষেত্রেই সমাজ-অসমর্থিত সম্পর্কে নারীর প্রণয়-বাসনার দৃপ্ত ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। আপাতসাদৃশ্য থাকলেও দুটির মূলগত অভিপ্রায় ভিন্ন। এমনকি 'সাহিত্য' পত্রিকার সুরেশচন্দ্র সমাজপতি "রবীন্দ্রবাবুর নষ্টনীড় ও চোখের বালি একখাতে" চললেও "উভয়ের স্বাতন্ত্র্য বড়ো সূক্ষ্ম" – এই বিষয়টি লক্ষ করেছেন। বিশেষভাবে 'নষ্টনীড়' গল্পে চারুলতার মর্যাদাদীপ্ত হৃদয়ধর্মের প্রাবল্যের কারণে পিসতুতো দেবর অমলের সঙ্গে একটি সমাজ-অসমর্থিত অথচ সংবৃত প্রণয় গড়ে উঠেছে। এর প্রায় সতেরো বছর পর 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তর 'ঠানদিদি' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ, মে-জুন ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ)। সেখানেও দেবর শচীকান্তর সঙ্গে তার দূর সম্পর্কীয় বৌদির প্রণয়কাহিনি গল্পের উপজীব্য; অথচ নরেশচন্দ্র ও তাঁর উত্তরসূরীরা অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট হয়েছেন।

৩

সজনীকান্ত দাস তাঁর 'আত্মস্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন,

> "যে অশ্লীলতার দাপাদাপি করিয়া 'কল্লোল' তাহার চতুর্থ পঞ্চম বর্ষে অন্য ধরনের নূতনত্ব সম্পাদন করিতে চাহিয়াছিল তাহারও আরম্ভ হইয়াছিল চিত্তরঞ্জন দাশ-প্রবর্তিত 'নারায়ণে' (১ম বর্ষ, ১৩২১-২২)।"[১২]

ফলত এই 'দাপাদাপি'কে প্রতিহত করার লক্ষ্যে তিনি শরণাপন্ন হলেন 'অভিভাবক' রবীন্দ্রনাথের। আগেই উল্লেখ করেছি, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ছিলেন 'কল্লোল' পর্বের সাহিত্যিকদের অগ্রজস্বরূপ। ইতিপূর্বে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে 'শনিবারের চিঠি'র তিনটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়; যথাক্রমে জ্যৈষ্ঠে 'জুবিলি সংখ্যা', আষাঢ়ে 'বিরহ সংখ্যা' ও কার্তিকে 'ভোট সংখ্যা'। 'শনিবারের চিঠি'র মাধ্যমে পরবর্তীকালে অত্যাধুনিক বাংলা সাহিত্য নিয়ে যে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটেছিল তার প্রথম আভাস দেখা দিয়েছিল উক্ত সংখ্যাগুলিতে। বিশেষত, 'বিরহ সংখ্যা' সমকালীন সাহিত্যকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর অমল হোম দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে (পঞ্চম অধিবেশন, পৌষ) 'অতি-আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্য' শীর্ষক একটি নিবন্ধ পাঠ করেন, যেটি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে অমল হোম দাবি করেন 'সৃষ্টির আনন্দে' নয়, সমকালীন সাহিত্য নির্মিত হচ্ছে "ইন্দ্রিয় লালসার ...অস্পষ্ট ইঙ্গিত" দেওয়ার জন্য। তাঁর প্রবন্ধ সজনীকান্ত দাসকে এই বিতর্কে নতুন মাত্রা সংযোজনে ত্বরান্বিত করে। তিনি নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তর কথা বিশেষভাবে উল্লেখপূর্বক জানান, 'শরৎবাবু এই সকল পত্রিকার ও লেখকদের রুচি দেখিয়া মর্মাহত হইয়াছেন।'[১৩] এভাবে তিনি পরিকল্পনামাফিক বিতর্কক্ষেত্রটিকে প্রস্তুত করেছেন। তাঁর স্মৃতিচারণায় উক্ত প্রসঙ্গকে উল্লেখ করে লিখেছেন,

> "যাহা হউক, শরৎচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথ। আমি রবীন্দ্রনাথকেও টলাইতে চাহিলাম।"[১৪]

এই মর্মে ২৩ ফাল্গুন ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে তিনি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে সমকালীন সাহিত্য সম্পর্কে অভিযোগ করে এবং এ-বিষয়ে তাঁর 'জবাব' প্রার্থনাপূর্বক তা প্রকাশের অগ্রিম অনুমতি চেয়ে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। সেখানে যে-সকল

সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে সজনীকান্ত তাঁর অনুযোগ করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম নামটি ছিল নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তর। তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন,

> "আজ থেকে দশ বৎসর ধ'রে আপনার লেখা প'ড়ে আমার ধারণা হয়েছে আপনি সাহিত্যে শ্লীলতার গণ্ডী পার হ'য়ে যাওয়ার পক্ষে নন। ...অথচ যে-সব জিনিষ নিয়ে আপনি আলোচনা করেছেন সেই সব জিনিষই আধুনিক এই লেখকদের হাতে পড়্লে কি রূপ ধারণ কর্ত ভাব্লে শিউরে উঠতে হয়। 'একরাত্রি', 'নষ্টনীড়', 'ঘরে বাইরে' এরা লিখ্লে কি ঘট্ত – ভাব্তে সাহস হয় না।"[১৫]

অথচ, পরবর্তী সময়ে সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে বিশিষ্ট সমালোচক দাবি করেছেন,

> "নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বাংলা গল্পের সূত্র ধরলেন 'নষ্টনীড়'-এর পর থেকে।... 'নষ্টনীড়'-এর গল্প-সমাপ্তি সমাজ-বিবেক-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ শিল্প-রসিকের মনে পলায়নপরতার যে নালিশ পুঞ্জিত করেছিল, 'ঠান্দি' যেন তার গাল্পিক জবাব।"[১৬]

প্রসঙ্গান্তরে এই মন্তব্যের তাৎপর্য আলোচিত হবে। আপাতত নরেশচন্দ্র সম্পর্কে সজনীকান্তর অভিমতটি কী ছিল তা জেনে নেব। তিনি ওই চিঠিতে আরও লিখেছেন,

> "নরেশবাবুর কোন বইয়ের সমালোচনায় আপনি তাঁর সাহসের প্রশংসা করেছেন। সেটা ব্যাজস্তুতি না সত্যিকার প্রশংসা, বুঝ্তে পারিনা। আমি নিজে এগুলিকে সাহিত্যের আগাছা ব'লে মনে করি।"[১৭]

এখানে বলা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের নরেশচন্দ্রর 'শাস্তি' উপন্যাস-প্রসঙ্গে করা মন্তব্যটি ওই বইয়ের শেষে সংযুক্ত হওয়ায় সজনীকান্ত ১৩৩৪-এর অগ্রহায়ণে 'শনিবারের চিঠি'তে সংযুক্ত মন্তব্য রবীন্দ্রনাথের নয় – এই যুক্তিতে তিনি নরেশচন্দ্রকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন। এর প্রত্যুত্তরে নরেশচন্দ্র পত্রাঘাত করেন রবীন্দ্রনাথকে। এই চিঠিতে 'কাঁটার ফুল' ও 'শাস্তি' উপন্যাসের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন তিনি এবং যুক্তি-প্রতিযুক্তি সম্বলিত নরেশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের এই বিতর্কমূলক পত্রালাপটি ১৩৩৪ সালে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় "সাহিত্য-ধর্ম্ম-এর জের"/'রবীন্দ্রনাথ ও নরেশচন্দ্র' শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য বিষয় এই যে, এরপরও সজনীকান্ত দাস প্রায় একই শিরোনামে একটি কাল্পনিক পত্রালাপ রচনা করেন 'বঙ্গবাণী'-তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ও নরেশচন্দ্র বিষয়ক উক্ত "সাহিত্য-ধর্ম্ম-এর জের"-কে ব্যঙ্গ করে। রচনাটির শিরোনাম 'সাহিত্য-ধর্ম্ম'-এর জের" এবং উপ-শিরোনাম 'রবীন্দ্রনাথ ও বেচারাম'! এখানে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তর পত্রের ব্যঙ্গাত্মক অনুকৃতি-পূর্বক সজনীকান্ত জনৈক বেচারাম কুণ্ডুর (নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত!) জবানীতে লেখেন,

> "আপনার নিকট হইতে আমার আলু ও কচুর 'প্রশংসা ও সমাদর লাভে আমার লোভ যতই থাকুক, তাতে আমার কর্তব্যজ্ঞান ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না' (ভাষা দেখিয়া হাসিবেন না, আমার ঢাকার যুবক-বন্ধুটি এই স্থানটি ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের লেখা হইতে চুরি করিয়াছে)।"[১৮]

"সাহিত্য-ধর্ম্ম-এর জের" – শীর্ষক 'বঙ্গবাণী' প্রকাশিত পত্রালাপ এবং 'মধু ও হুল' গ্রন্থে ওই একই শিরোনাম ও ভিন্ন ব্যঙ্গাত্মক উপ-শিরোনামে সংকলিত সজনীকান্ত দাসের রচনাকর্মটি সমান্তরালভাবে পাঠ করলেই রবীন্দ্রনাথ ও নরেশচন্দ্রর বিতর্কের আবহটি তৎকালীন সাহিত্যসমাজ পরিমণ্ডলকে কতটা উষ্ণ ও উত্তাল করে তুলেছিল তা অনুমান করা যাবে।

কথান্তরে না গিয়ে ২৩ ফাল্গুন সজনীকান্তর লেখা পত্র বিষয়ে আসা যাক। এই চিঠির প্রত্যুত্তরে ২৫ ফাল্গুন, ১৩৩৩-এ রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "আধুনিক সাহিত্য আমার চোখে পড়ে না। দৈবাৎ কখনো যেটুকু দেখি, দেখ্তে পাই, হঠাৎ কলমের আব্রু ঘুচে আছে।... সুসময় যদি আসে তখন আমার যা বল্বার বল্ব।"[১৯] রসিকতা বুঝে আপাতভাবে সজনীকান্তর আর্জি খারিজ[২০] করে দিলেও 'বিচিত্রা' পত্রিকার ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'সাহিত্য-ধর্ম্ম' প্রবন্ধটি। সেখানে আধুনিক সাহিত্যের 'বে-আব্রুতা' বিদেশ থেকে আমদানীকৃত বলে মন্তব্য করে রবীন্দ্রনাথ কার্যত অমল হোম ও সজনীকান্ত দাসকেই সমর্থন করেন। আধুনিক সাহিত্যের ত্রিসীমানায় 'হাট' না থাকলেও 'হট্টগোলে'র অভাব নেই সে-কথাও উল্লেখ করেন তিনি। এরপরই ১৩৩৪ সালের 'শনিবারের চিঠি'র ভাদ্র সংখ্যায় 'আধুনিক বাঙলা সাহিত্য' শীর্ষক শিরোনামে সজনীকান্তর একটি প্রবন্ধের সঙ্গে উক্ত চিঠিদুটি প্রকাশিত হলে যুযুধান দুই পক্ষের আক্রমণ আরও শাণিত হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের মালয় ভ্রমণকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সৃষ্টি হলে নরেশচন্দ্র 'ফরোয়ার্ড'

পত্রিকায় তাঁকে কটাক্ষ করলে তার প্রত্যুত্তরে অমল হোম ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়রা তাঁদের লেখাপত্রের মধ্য দিয়ে নরেশচন্দ্রকে বিদ্রূপ করেন।

অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের প্রতিবাদ করে নরেশচন্দ্র ১৩৩৪ সালের 'বিচিত্রা' পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় লেখেন 'সাহিত্যধর্ম্মের সীমানা'। তিনি মন্তব্য করেন,

> " 'চোখের বালি'র অনেকগুলি দৃশ্য অনেকের মতে অতিরিক্ত বে-আব্রু। 'ঘরে-বাইরে'র অনেকটা তো বটেই। অথচ আমরা তা' মনে করি না এবং সম্ভবতঃ কবীন্দ্রও তাহা মনে করেন না।"[২১]

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সাহিত্য-প্রতর্কে আবির্ভূত হয়ে তিনি তাঁর এই প্রবন্ধে আধুনিক সাহিত্যে অশ্লীলতার প্রসঙ্গটি যথাসম্ভব যুক্তিযুক্ত উপায়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই যুযুধান দুই পক্ষের সমান্তরাল একটি সমালোচনা করে ১৩৩৪-এ 'উত্তরা'র ভাদ্র সংখ্যায় লেখেন 'সাহিত্যে দলাদলি' নামক একটি প্রবন্ধ। যদিও এই বাগ্‌বিতণ্ডার অবসান তাতে ঘটেনি বরং নরেশচন্দ্রর নিবন্ধের জবাব স্বরূপ ১৩৩৪-এর 'বিচিত্রা'র আশ্বিন সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী লেখেন '"সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা" – বিচার'। দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ তাঁর দীর্ঘ নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ-নরেশচন্দ্রর তুল্যমূল্য বিচারের দ্বারা নরেশচন্দ্রকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এর আগে যে শরৎচন্দ্রর প্রসঙ্গ 'শনিবারের চিঠি'তে আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি বিরূপভাবাপন্ন বলে উল্লিখিত হয়েছিল; সেই শরৎচন্দ্র এবার স্বয়ং এই দ্বৈরথে অংশগ্রহণ করলেন ১৩৩৪-এর 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে। তিনি লেখেন,

> "আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি কবির এত বড় অবিচারে শুধু নরেশচন্দ্রের নয়, আমারও বিস্ময় ও ব্যথার অবধি নাই।"[২২]

শরৎচন্দ্রর এরূপ প্রায় বিপরীত অবস্থানের পশ্চাদে 'পথের দাবী' সংক্রান্ত বিষয়ে রবীন্দ্র-শরৎ মতানৈক্যের পাশাপাশি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তর সুতীক্ষ্ণ যুক্তির প্রতি সমীহ। ফলত অশ্লীলতা অনুষঙ্গে তিনি কেবল আধুনিক সাহিত্যিকদের অনুপুঙ্খ থাকলেন না, 'সাহিত্য-ধর্ম্ম'-এর বিরুদ্ধেও 'সবিনয় প্রতিবাদ' করলেন। এই প্রতিবাদ ব্যক্তিগত পরিসর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। একদিকে বসন্তকুমার ভৌমিকের 'সাহিত্যে স্বেচ্ছাচারিতা'র (১৩৩৪ আশ্বিন, 'মানসী ও মর্ম্মবাণী') মতো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে আধুনিক সাহিত্যে যৌনতার স্বাধীন প্রকাশ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "এইগুলি সাহিত্য নহে – ইহা মা সরস্বতীর প্রাঙ্গণের আবর্জনা;..." ইত্যাদি।[২৩] অন্যদিকে 'নারায়ণ' পত্রিকাগোষ্ঠীর অন্যতম সর্বোপরি রাধাকমল মুখোপাধ্যায় সাহিত্যের এই প্রবণতাটিকে অস্বীকার না করে 'সাহিত্যের নব-কলেবর'-কে (১৩৩৪, আশ্বিন, 'উত্তরা') স্বাগত জানিয়ে লিখেছেন,

> "আমরা তাঁহাকে অনতিদূর অতীত হইতে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিতেছি।"[২৪]

ফলশ্রুতিতে নিজের বক্তব্যকে অভ্রান্ত প্রমাণ করতে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পুনরায় অবতীর্ণ হন সজনীকান্ত। কলম ধরেন তিনি স্বয়ং। ১৩৩৪ সালে 'শনিবারের চিঠি'র কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তাঁর প্রবন্ধ '"সাহিত্য-ধর্ম্ম" প্রসঙ্গে'। সেখানে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে 'চিরন্তন সত্য'-এর স্থানে উন্নীত করে নরেশচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রর বিরুদ্ধেও আক্রমণ শাণিত করেন সজনীকান্ত। মূলত শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর পূর্বকৃত মন্তব্যের কারণে শরৎ-অস্বস্তিকে প্রশমিত করতে শুধু 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' নয়, শরৎচন্দ্রর এ-বিষয়ক অপর একটি প্রবন্ধ 'রস-সেবায়েৎ' ('আত্মশক্তি', পঞ্চবিংশ সংখ্যা) প্রসঙ্গ উত্থাপন করে সেটি নিয়েও তিনি যথেচ্ছ সমালোচনা করেন।

আবার, 'শনিবারের চিঠি'তে সত্যসুন্দর দাস ছদ্মনামে মোহিতলাল সাহিত্যে যৌনাচারকে ব্যঙ্গ করে লেখেন 'সাহিত্যের আদর্শ' (১৩৩৪, কার্তিক)। ঘটনা-পরম্পরার প্রাণোদনায় উৎসাহিত নরেশচন্দ্র মূলত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের বক্তব্য খণ্ডনের উদ্দেশ্যে রচনা করেন 'কৈফিয়ৎ বা সাহিত্য-ধর্ম্মর সীমানা বিচারের উত্তর' (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, অগ্রহায়ণ, 'বিচিত্রা' পত্রিকা) শীর্ষক আরও একটি প্রবন্ধ। এই দ্বন্দ্বমূলক আবহের অনিবার্য ফলস্বরূপ পুনরায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রকাশিত হয়। 'সাহিত্য-ধর্ম্ম'র পরিপূরক হিসেবে 'সাহিত্যে নবত্ব' ('যাত্রীর ডায়ারি' শিরোনামে, ১৩৩৪, অগ্রহায়ণ, 'প্রবাসী' পত্রিকা) প্রবন্ধের মাধ্যমে। সাহিত্যে যৌনতার নগ্ন প্রকাশ রূপ 'রিয়ালিটির কারি পাউডার'-এর প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই সুতীব্র অনিহা প্রকৃতপক্ষে তাঁকে আধুনিকতার পরিপন্থী রূপে প্রতিভাত করলেও বস্তুত তাঁর আধুনিকতা প্রশ্নাতীত। অপরপক্ষে

নরেশচন্দ্রও তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে 'যৌন সম্বন্ধের শারীর ব্যাপার' নিয়ে 'পাঠক চিত্তের রিরংসার উপর বাণিজ্য করার' প্রশ্নে বিমুখ (প্রসঙ্গত, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের '"সাহিত্য-ধর্ম্মর সীমানা" – বিচার' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) ছিলেন এবং আধুনিক সাহিত্যিকরা বিশেষত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তর রবীন্দ্র-সাহিত্যকে বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে দেখলেও তার প্রতি তাঁরা বীতশ্রদ্ধ ছিলেন না। যেমন সমকালে 'বঙ্গবাণী' (১৩৩৪, অগ্রহায়ণ) পত্রিকায় প্রকাশিত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যর 'সাহিত্য ও রস' অনুসরণ করে বলা যেতে পারে,

> "রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংও যে এই অবস্থার জন্য একেবারে দায়ী নহেন এমন বলা যায় না, কিন্তু নরেশচন্দ্র প্রভৃতি যাহাই বলুন তাঁহার এই আক্ষেপ ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার নহে।"[২৫]

সাহিত্যে এই 'অশ্লীলতা' সংক্রান্ত বিতর্কপর্ব আরও অগ্রসর ও বহুব্যাপ্ত হয়। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ ও নরেশচন্দ্র উভয়ের সময় ও প্রবণতাগত পার্থক্যের কারণেই সাহিত্যে তাঁদের বহিঃপ্রকাশ ছিল ভিন্নধর্মী। সুতরাং, রবীন্দ্র-নরেশচন্দ্র বিতর্ক একদা তীব্র আকার ধারণ করলেও পরবর্তীকালে তা অনিবার্যভাবে অবসিত হয়েছে।

এই সামগ্রিক বাদানুবাদের প্রেক্ষিতে বলা যায়, সময়গত ব্যবধান ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যই যাবতীয় প্রশ্নগুলি উত্থাপনের সহায়ক হয়েছে। কারণ, যে অশ্লীলতার অভিযোগ নিয়ে এই বিতণ্ডার সূত্রপাত তার পরিপোষণ অনেকক্ষেত্রেই করেছেন তথাকথিত প্রাচীনপন্থী হিসেবে পরিচিত প্রাবন্ধিক-সমালোচকগণ। অপরপক্ষে, সাহিত্যকে সাবালকের ভূমিকায় উত্তীর্ণ করতে সহায়ক হয়েছেন যাঁরা, তাঁরাই কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাহিত্যের এই নতুন প্রবণতাকে স্বীকৃতি দিতে চাননি, সময়বিশেষে তাকে নস্যাৎ করে দিতেও দেখেছি আমরা। অতএব, আপাতভাবে বিস্ময়ের উদ্রেক করলেও ঠাকুরবাড়ির পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট 'ভারতী'-তে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত রচিত সাহিত্য সম্পর্কিত সমালোচনা ছাড়াও তাঁর স্বরচিত প্রবন্ধ এমনকি উপন্যাস প্রকাশ হয়েছে এবং এই বিষয়টিকে সময়ের সেই অপ্রতিরোধ্য প্রবণতা হিসেবেই গ্রাহ্য করতে হবে; একটা সময়ের পর যাকে প্রায় কেউই অস্বীকার করতে পারেননি। এই একই সূত্রে 'নারায়ণ' পত্রিকায় নরেশচন্দ্রর 'ঠানদিদি'র মতো গল্প প্রকাশের মতো ঐতিহাসিক বিষয়টিও মান্যতা পেয়ে যায়।

৪

রবীন্দ্রনাথ ও নরেশচন্দ্রর সম্পর্কের বিশ্লেষণকল্পে তাঁদের পারস্পারিক এবং তাঁদেরকে কেন্দ্র করে যে সামগ্রিক একটি বিতর্কের প্রস্তাবনা করা হয়েছে তার কেন্দ্রীয় বিষয় হল সাহিত্যে যৌনতার মানদণ্ড নিরূপণ ও তার শৈল্পিক উপস্থাপন। আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, এই বিতর্ক বহুদূর পরিব্যপ্ত হয়েছিল। সঙ্গত কারণেই আমরা এখানে তার সর্বাবয়ব রূপকল্পটি উপস্থাপন করিনি। কারণ, প্রবন্ধের প্রথমাংশে আমাদের প্রশ্ন ছিল, রবীন্দ্রনাথ ও নরেশচন্দ্রর প্রায় একই বিষয়ভিত্তিক দুটি গল্প অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য 'নষ্টনীড়' ও 'ঠানদিদি'-র মধ্যে সম্পর্ক ও তার মূলগত ভিত্তি বিষয়ক। আলোচ্য গল্পদুটি রচিত হওয়ার দীর্ঘ সময় পর রবীন্দ্রনাথ ও নরেশচন্দ্র-বিতর্ক অনুষঙ্গটির সূত্র পরম্পরার উল্লেখ অনিবার্যভাবে সেই কূট প্রশ্নের নিরসন ঘটিয়েছে।

আমাদের পরবর্তী প্রসঙ্গ হল, সমাজ-অসমর্থিত নিষিদ্ধ প্রেম কিংবা যৌনতার 'বে-আব্রুতা'-সূচক যে অভিযোগ রবীন্দ্রনাথ ও নরেশচন্দ্রর বিরোধের মূলে – তার প্রায়োগত ক্ষেত্রটির তুলনামূলক আলোচনা। ইতিপূর্বে গল্পদুটির প্রকাশকাল সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আমরা জেনেছি। এবার আসা যাক, গল্পদুটির বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য প্রসঙ্গে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'নষ্টনীড়'-এর বিষয় ও শিল্পগত আলোচনা অপ্রতুল নয়, বরং ১৯৬৪ সালে প্রখ্যাত পরিচালক-কর্তৃক তার চলচ্চিত্রায়ণের (সত্যজিৎ রায়, 'চারুলতা') পর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং এখনও বিভিন্ন দৃশ্যমাধ্যমে (উদাহরণস্বরূপ সম্প্রতি OTT প্ল্যাটফর্ম কর্তৃক উপস্থাপিত 'নষ্টনীড়' সিরিজ) তার রূপায়ণ ঘটে চলেছে। রবীন্দ্র-জীবনের ব্যক্তিগত সম্পর্কের নিরিখ ও তাঁকে কেন্দ্র করে সাধারণের ঔৎসুক্য (একুশ শতকে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ-কেন্দ্রিক ফিকশন রচনার ধারা প্রসঙ্গত স্মরণীয়) আপাতভাবে জনপ্রিয়তার উপাদানহীন দীর্ঘ একটি গল্পকে পাঠকমধ্যে জনপ্রিয় করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের সর্বাধিক আলোচিত গল্পর মধ্যে 'নষ্টনীড়' অন্যতম। এক্ষেত্রে জনপ্রিয়তার যে সূচকটি ক্রিয়াশীল তা হল লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের প্রেক্ষিত। এই সূত্রে পূর্বোদ্ধৃত রবীন্দ্র-বিরোধীগোষ্ঠীর একজন অন্যতম হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের একটি গল্প বিবেচ্য। গল্পটির নাম 'প্রণয়ের পরিণাম'। 'সাহিত্য' পত্রিকার দশম বর্ষ প্রথম

সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩০৬) প্রকাশিত এই গল্পটি পাঠকমহলে এত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে যে সংখ্যাটি পুনর্মুদ্রিত হয়। সেখানে বোম্বাই প্রবাসকালে আন্না তড়খড়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ও তাঁর বিবাহিত জীবন সম্পর্কে সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত, ইঙ্গিতপূর্ণ মুখরোচক কাহিনির বিস্তার ঘটানো হয়েছে। এর অনতিবিলম্ব রচনা হল 'নষ্টনীড়'। অন্যদিকে, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর সমকালে ছিলেন একজন জনপ্রিয় লেখক। সর্বোপরি, তাঁর রচনার মধ্যে জনপ্রিয়তার যাবতীয় উপাদান মজুত ছিল। যদিও 'ঠানদিদি'ই ছিল তাঁর স্বনামে প্রকাশিত প্রথম ছোটগল্প। এর আগে 'দ্বিতীয় পক্ষ' নামে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় আরেকটি গল্প প্রকাশিত হলেও গল্পকার তখনও তাঁর লেখনী সম্পর্কে নিঃসংশয় ছিলেন না। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত 'গল্প-লেখার গল্প'-এ (৭ এপ্রিল, ১৯৪৫) জানিয়েছেন, "মনে ভারী সংশয় ছিল, – হয়ত' গল্পটা ভাল হয় নি। ... সেই ভয়ে লিখে দিলাম, নামটা যেন দয়া করে না ছাপেন।"[২৬] ফলত প্রথম প্রয়াসের ভীরু পদক্ষেপজনিত সংকোচ গল্প-অবয়বের মধ্যেও বর্তমান। বলা বাহুল্য, গল্পটি অধিক আলোচিত কিংবা প্রশংসিত কোনওটিই নয়।

'নষ্টনীড়' ও 'ঠানদিদি'র প্রকাশের ক্রম থেকে স্পষ্টরূপে অনুধাবন করা যায় যে, দুটির মধ্যে দৈর্ঘ্যগত ভিন্নতা বিদ্যমান। মোট কুড়িটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত 'নষ্টনীড়' গল্পটির মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা হল ৪০ ('গল্পগুচ্ছ', বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৪২৪)। অন্যদিকে, চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত 'ঠানদিদি' গল্পটির পৃষ্ঠাসংখ্যা হল ১২ (বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত 'নারায়ণ পত্রিকার গল্প-সংকলন', নাথ পাবলিশিং, মাঘ ১৪১৫)। এই পৃষ্ঠাসংখ্যার তারতম্যের আপাত কোনও তাৎপর্য না থাকলেও আসলে এতে গল্পের পরিসরগত বিস্তৃতি এবং আবহ নির্মাণে লেখক কতটা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সেই পরিসরকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন মোটের উপর তার একটা ধারণা পাওয়া যায়। আয়তনগত বিস্তারের সঙ্গে যদিও গল্পের গুণগত মানের কোনও সম্বন্ধ নেই। দৈর্ঘ্যগত ভিন্নতায় 'স্ত্রীর পত্র'র সমান্তরালে 'মৃণালের কথা'কে স্মরণ রাখলে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে আয়তনিক বিস্তৃতি ও তার আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের হেরফের গল্পদুটিকে শিল্পোত্তীর্ণ করতে অনুকূল অথবা প্রতিকূল ভূমিকা পালন করেছে কিনা তা 'নষ্টনীড়' ও 'ঠানদিদি'র পাঠভিত্তিক আলোচনা থেকেই পাওয়া সম্ভব।

'নষ্টনীড়'-এর সূচনা ভূপতি চরিত্রটির উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে। ধনী ভূপতির "ছেলেবেলা হইতে ইংরাজি লিখিবার এবং বক্তৃতা দিবার শখ ছিল।" নিতান্ত অর্থাভাব না থাকলেও 'গ্রহবশত' 'কাজের লোক' হয়ে জন্মগ্রহণ করার সুবাদে ভূপতিকে "অল্পবয়সে সম্পাদকি নেশা ও রাজনৈতিক নেশা অত্যন্ত জোর করিয়া ধরে।" স্বাভাবিকভাবেই অর্থের বাহুল্যের কারণে "ভূপতিকে মাতিয়ে তুলিবার লোকও ছিল অনেক।" ফলস্বরূপ ধনী ভূপতির কাছে অর্থ প্রভূত থাকলেও সময় ছিল অপ্রতুল। এহেন ভূপতির স্ত্রী চারুলতা। যার মনোগত অভিপ্রায় ও অন্তর্লীন সংকট এই গল্পকে অগ্রসর করবে। ভূপতি চরিত্রটির প্রথম অভিব্যক্তির মধ্যেই চারুলতা চরিত্রটির সংকটের মূলগত কারণটি আভাসিত। গল্পে বিক্ষিপ্ত কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ যেমন 'ভারত-গবর্নমেন্টের সীমান্তনীতি' (ইন্দো-আফগান বর্ডার যা ডুরান্ড লাইন নামে পরিচিত তৎসংক্রান্ত নীতি), ইংরেজ সরকারের বাজেটের প্রভৃতি থেকে আমরা অনুমান করতে পারি, গল্পর প্রেক্ষাপট উনিশ শতকের অন্তিম পর্ব, যার সঙ্গে গল্পটির রচনার সময়কাল প্রায় অভিন্ন। 'নষ্টনীড়'-এর স্থানিক প্রেক্ষাপট কলকাতা। ময়মনসিংহ, বর্ধমান, বিলেত, চুঁচড়ো, হাবড়া, হাওড়ার ইত্যাদি স্থাননামের উল্লেখ থাকলেও সাধারণভাবে মূল ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ভূপতি-চারুলতার গৃহের অন্তঃপুর ও বাগানে। সুতরাং, উনিশ শতকীয় কালপর্বে শহরকেন্দ্রিক, ধনী, শিক্ষিত, প্রগতিশীল একটি পরিবারের কাহিনি। গল্পে বাহ্যিক সমস্যা সংক্রান্ত ঘটনার ঘনঘটা কম বরং মনোজগতের সমস্যাই এর উপজীব্য।

ইংরেজি কাগজের সম্পাদক ও বক্তৃতাপ্রিয় ভূপতির সদ্যযৌবনা স্ত্রী চারুলতার ধনীগৃহে কোনও কর্ম ছিল না। "ফলপরিণামহীন ফুলের মতো পরিপূর্ণ অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠাই তাহার চেষ্টাশূন্য দীর্ঘ দিনরাত্রির একমাত্র কাজ ছিল।" 'অভাবহীন' চারুলতার স্বামীকে নিয়ে 'দাম্পত্যলীলায়' মেতে ওঠার কোনও অবকাশ ছিল না, চারুর পক্ষে "কাগজের আবরণ ভেদ করিয়া স্বামীকে অধিকার করা" যেমন দুরূহ ছিল; তেমনই চারুর প্রকৃত অভাব কী, তার অন্তর্নিহিত সত্তাটির সন্ধানও ভূপতির অবজ্ঞাত ছিল। ভূপতির দাম্পত্য-ধারণায় 'স্ত্রীর প্রতি অধিকার কাহাকেও অর্জন করতে হয় না, স্ত্রী ধ্রুবতারার মতো নিজের আলো নিজেই জ্বালাইয়া রাখে – হাওয়ায় নেবে না, তেলের অপেক্ষা

রাখে না।' ফলে চারুলতার নিঃসঙ্গতার সমাধান স্বরূপ তার সঙ্গীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় গল্পর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র মন্দা ওরফে মন্দাকিনী, সম্পর্কে ভূপতির শ্যালকজায়া।

এই তিনটি চরিত্রর পারস্পারিক সম্পর্কের শিথিলতায়, বিশেষত মন্দার আগমনে ভূপতির চারুর প্রতি মনোযোগ নিস্প্রয়োজন অনুভূত হওয়ার ফলস্বরূপ তাদের দাম্পত্য "নূতনত্বের স্বাদ না পাইয়াই উভয়ে উভয়ের কাছে পুরাতন পরিচিত অভ্যস্ত হইয়া গেল।" মন্দা ও ভূপতির মধ্যে সরাসরি কোনও সম্বন্ধ না থাকলেও মন্দার এই আগমন চারু ও ভূপতিকে আরও দূরবর্তী এবং তাদের দাম্পত্যকে চিরাভ্যাস্ত একটি ঘটনায় পর্যবসিত করেছে। লক্ষণীয়, গল্পকার লিখেছেন, "লেখাপড়ার দিকে চারুলতার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল বলিয়া তাহার দিনগুলা অত্যন্ত বোঝা হইয়া উঠে নাই।" অর্থাৎ, একাকী নিরবলম্ব একটি নারী চরিত্র লেখক পরিকল্পনা করলেও তাকে নিতান্তই অমননশীল কিংবা স্থূল দাগে তৈরি করেননি; বরং চরিত্রটির স্বকীয়তা, সর্বোপরি তার নিজস্ব একটি পরিসর থাকার ইঙ্গিত দিয়েছেন গল্পকার। এই প্রাসঙ্গিক প্রতিবেশ নির্মাণের পর অবতারণা ঘটেছে অমল চরিত্রটির।

ভূপতির পিসতুতো ভাই অমল। অর্থাৎ সম্পর্কে সে চারুলতার দেবর। ভূপতি ও চারুলতার পারস্পারিক আদানপ্রদানের মধ্যে যে নিলীন স্বভাবজ স্থিরতা তার ঠিক বিপরীত কতগুলি বৈশিষ্ট্যের সমাহার অমল। সে কলেজের থার্ড ইয়ারের ছাত্র। চারুলতার প্রতি 'স্নেহের উপদ্রব', 'আবদার', 'কৃত্রিম কোপ এবং বিদ্রোহ'-এ অমল চারুলতার সুস্থির, নিরুপদ্রব, বৈচিত্রহীন জীবনে কতকটা স্বস্তির উপদ্রব, চাঞ্চল্য ও প্রণোদনার সঞ্চারকারী। ফলত চারুর যাপন হয়ে ওঠে অমল অভিমুখী। বিশেষভাবে লক্ষ করার বিষয় হল, ভূপতি, চারু ও অমল – এই তিনটি চরিত্রর মধ্যে কারও আগমন অপ্রত্যাশিত নয়। এমনকি গল্পে অমলের আকস্মিক আগন্তুক হওয়ার কোনও ইঙ্গিত নেই বরং মন্দার আগমন চারুলতার স্বভাব বৈপরীত্যকে উদ্দীপিত করেছিল। অমল ও চারুর একান্ত নীড় রচনায় মন্দার ভূমিকা ছিল প্রথমাবস্থায়। অমল ও চারুর সম্পর্কের নিরীহ কিছু খুনসুটির দৃষ্টান্তপূর্বক কথক বলেন, "ধনীর সংসারে চারুকে আর কাহারও জন্য কিছুই করিতে হয় না, কেবল অমল তাহাকে কাজ না করাইয়া ছাড়ে না। এই-সকল ছোটোখাটো শখের খাটুনিতেই তাহার হৃদয়বৃত্তির চর্চা ও চরিতার্থতা হইত।" আপাত নিরীহ স্নেহের এই সম্পর্ক ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে পরস্পরের একান্ত একটি পরিসর তৈরি করে, যার সূচনা ঘটে ভূপতির অন্তঃপুরের একখণ্ড জমিকে উভয়ের বাগানে পরিণত করার বাসনায়। "আমড়াগাছের ছায়ায় বসিয়া চারু এবং অমল অসাধ্য সংকল্পের কল্পনাসুখ বিস্তার করিতেছিল।" অমল ও চারুর এই বাগানবিলাস কার্যত বাহ্যিক একটি ঘটনা। বস্তুত "তাহাদের সমস্ত সংকল্পগুলির প্রধান সুখ এবং গৌরব এই ছিল যে, সেগুলি তাহাদের দুজনের মধ্যেই আবদ্ধ।" এই গোপনচারিতা চারুর নিঃসঙ্গ, উত্তেজনাহীন, উদ্দেশ্যহীন জীবনে যে রোমাঞ্চ ও বৈচিত্র সৃষ্টি করেছিল তাতে স্বভাবতই মন্দা এমনকি ভূপতিরও কোনও অংশ ছিল না। অমলকে কেন্দ্র করে চারুর একান্ত নীড় রচনায় অমল অনুঘটকের কাজ করেছে মাত্র। ফলে বাগান করা ও আকাশকুসুম চয়ন প্রায় সমার্থক হয়ে উঠলে চারুর উৎসাহেই আরম্ভ হয় 'কাব্যকুসুমের চাষ'। উভয়ের ক্রীড়াচ্ছলে রচিত অমলের 'আমার খাতা' নাম্নী প্রবন্ধটি যখন মাসিক 'সরোরুহ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তখন দেখা গেল উভয়ের এই কুসুমাস্তীর্ণ আলাপ যেন চারুর কাছে কণ্টকবিদ্ধ বিলাপে পরিণত হয়েছে। কথক বলেছেন, "শুনিয়া চারু খুশি হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু খুশি হইতে পারিল না।" বস্তুত এখান থেকেই চারুলতার সংকটের সূচনা। "অমলের লেখা অমল এবং চারু দুজনের সম্পত্তি।" লেখক হিসেবে অমলের আত্মপ্রকাশ ও খ্যাতি যেন "হঠাৎ তাহাদের কমিটির রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া বাংলাদেশের পাঠকমণ্ডলী তাহাদের দুজনকার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।" একান্ত স্নেহ-ভালোবাসার আধারটির প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক অধিকারবোধ চারুর অন্তস্তলে তার উন্মোচন ঘটতেই অমলের সঙ্গে তার সামাজিক সম্পর্কের নীতি কোথাও লঙ্ঘিত হয়ে গেছে। অমল ও চারুর সম্পর্কের এই রসায়ন সমাজ সমর্থিত যেমন নয়, তেমনই নেহাত কার্যকারণহীন চকিতে ঘটা কোনও ঘটনাও নয়। যে-কারণে বহু পল্লবিত ঘটনা পরম্পরার সচেতন বিন্যাসের দ্বারা গল্পকার চারুলতার সংবেদনশীল মনের অমলের প্রতি অসচেতন অগ্রগমণকে মান্যতা দিয়ে চেয়েছেন।

ভূপতির অমলের হাতে চারুর শিক্ষাভার প্রদান এবং অমল ও চারুর নিভৃত পাঠালাপে মন্দার আকস্মিক অনুপ্রবেশজনিত কারণে চারুর ঈর্ষার উদ্রেক – সমূহ ঘটনা অমলের প্রতি চারুকে আরও নিবিষ্ট করে তুলেছে। অবশ্য

স্মরণীয়, উক্ত ঘটনা পরম্পরায় অমলের উপস্থিতি সক্রিয় ভূমিকা পালন করলেও চারুর অমল-কেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনায় তার অংশীদারিত্ব প্রায় শূন্য। চারুর এই মনোগত সংকট অমলের অজ্ঞাত থেকেছে দশম পরিচ্ছেদের পূর্ব পর্যন্ত। উদাহরণস্বরূপ, পঞ্চম পরিচ্ছেদে অমলের "কমলাকান্তের দপ্তরের সমালোচনা"র পাঠের আসরে নব্য, একনিষ্ঠ ও একমাত্র শ্রোতা মন্দার উপস্থিতি চারুকে গৌরবান্বিত করেনি বরং ঈর্ষান্বিত করেছে। মন্দা ও অমলের আসরের রসভঙ্গ করতে উদ্যত হয়েছে সে। গল্পর তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'আষাঢ়ের চাঁদ' শীর্ষক অমলের একটি রচনা পাঠে ভূপতিকে অনুরোধ করার মধ্যে অমলের অসামান্যতা প্রদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে চারু এবং প্রত্যাশা করেছে ভূপতির অমলের প্রতি সপ্রশংস মনোভঙ্গি, গৃহে স্ব-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার। অথচ মন্দার ক্ষেত্রে চারুলতা যে ঠিক তার বিপ্রতীপ আচরণ করেছে– যা নারীর স্বভাবজ যৌনঈর্ষা ও তার অভিপ্রেত পুরুষটির একনিষ্ঠতার অপ্রাপ্তিজনিত হতাশা থেকে উদ্ভূত। অমলের কর্মচাঞ্চল্য সম্পৃক্ত জীবনই সম্ভবত অমলকে চারুলতার এই পরিবর্তনের প্রতি মনস্ক করে তোলেনি। ফলশ্রুতিতে "অমল চারুর প্রতি রুষ্ট" হলেও তাকে নিতান্তই 'ছেলেমানুষী' হিসেবে গণ্য করেছে।

চারুর চরিত্রগত রূপান্তরের পর্যায়টি গল্পকার সযত্নে কাহিনিমধ্যে বয়ন করেছেন এবং এই পর্বান্তর কিছুটা যেন রসশাস্ত্রের প্রেমোন্মত্ত নায়িকার রূপকল্পকে তুলে ধরেছে। দশম পরিচ্ছেদের পূর্ব পর্যন্ত বিশেষভাবে চারুলতার মনস্তাত্ত্বিক সংকটের যে চিত্র পাওয়া যায় তা হল –

এক. 'ঈর্ষা জন্মাইবার জন্য' অমলের সমসাময়িক লেখক মন্মথ দত্তর প্রশংসাসূচক উল্লেখ করে চারুর অমলের মনোযোগ আকর্ষণের প্রচেষ্টা।

দুই. ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অমলের একক সাহচর্য প্রাপ্তির ব্যর্থতায় ও মন্দা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর প্রমাণের তাগিদে চারুর স্বতন্ত্র রচনার প্রয়াস। যেমন, একদিকে 'শ্রাবণের মেঘ' রচনায় অমলের লেখনীর অমোঘ প্রভাব এবং অন্যদিকে 'কালীতলা' শীর্ষক রচনার মাধ্যমে চারুর স্বকীয় লেখনীর প্রতি অমলের আকর্ষণ ও শেষ্ঠত্ব প্রমাণ।

তিন. একান্তভাবে "দুই সম্পাদক, দুই লেখক এবং দুই পাঠকের" কাগজ প্রকাশের ইচ্ছের মাধ্যমে চারুলতার অমলের সঙ্গে মন্দা ও বাইরের লোকের সাক্ষাতের দ্বার রুদ্ধ করার চেষ্টা। এর পরিপার্শ্বে অমলের "সাবেক কালের ঠাঁট বজায় রাখিবার" চেষ্টা এবং শেষত 'গোপনতার উৎসাহ'র অবসান।

চার. সপ্তম পরিচ্ছেদে চারুর লেখিকা রূপে আত্মপ্রকাশ। একদিকে, 'বিশ্ববন্ধু' পত্রিকায় চারু ও অমলের প্রতিতুলনায় একদিকে ভূপতির স্ত্রীকে সবিস্ময় ও সসম্ভ্রম আবিষ্কার। অন্যদিকে, চারুলতার প্রতি 'তিক্তস্বাদ' চিত্ত অমলের মন্দার প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি। অমলের উপেক্ষা ও অপ্রত্যাশিত আচরণে চারুর 'অতিনিভৃত' 'ক্ষুদ্র সাহিত্যনীড়'-এর স্খলন।

পাঁচ. অষ্টম পরিচ্ছেদে অমলের প্রতি চারুর সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ ও স্বামীর প্রতি অনিচ্ছাকৃত অনাগ্রহের বহিঃপ্রকাশ। মন্দা ও অমলের অনৈতিক সম্পর্কের ইঙ্গিতের মাধ্যমে চারুর তার ও অমলের মধ্যবর্তী দূরত্ব মোচন করার অসংযত প্রকাশ।

উক্ত ঘটনাসমূহের অনিবার্যতায় মন্দার সঙ্গে অমলের অন্যায় বিচ্ছেদ ঘটে এবং ভূপতির চরমতম সংকটকালে চারুলতার মানসিক অনুপস্থিতিতে সহসা যেন অমলের সামনের 'মেঘের কুয়াশা' কেটে যায়। অমল অনুভব করে তার সম্মুখে প্রতীয়মান চারু নামক "সহস্র হস্ত গভীর গহ্বরের মধ্যে সে পা বাড়াইতে যাইতেছিল।"

একাদশ পরিচ্ছেদ থেকে স্বভাবতই ঘটনার অভিমুখ দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে। ভূপতির অমলের বিবাহের প্রস্তাবে বিচলিত চারু তীক্ষ্ম বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করেছে তার দেবরকে। অবশেষে দ্বাদশ পরিচ্ছেদে অমল ও চারুর বিচ্ছেদ সূচিত হয়েছে। 'তরুণতার স্ফূর্তি'-তে একদা চারুলতাকে মাতিয়ে রেখেছিল যে অমল, সংকটাপন্ন ও সান্ত্বনাহীন ভূপতির প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের আশঙ্কায় ক্লিষ্ট হয়ে সেই অমলই চারুর সঙ্গে তার বিচ্ছেদকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলে দাদার প্রতি অনুগত থাকতে চেয়েছে। এই বিচ্ছেদে বৌদি-দেবরের সামাজিক সম্পর্কের যে নীতি বাহ্যত তা রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু চারুর মন ততদিনে সম্পূর্ণরূপে ভূপতির প্রতি বিমুখ। শুধু তাই-ই নয়, অমলের প্রতি মগ্নতায় ভূপতির বাহ্যিক সংকট চারুলতার অজ্ঞাতই থেকে গেছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ থেকে অমল, চারুলতা ও ভূপতির ত্রিকোণ সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। চারুলতা-অমল-মন্দাকিনীর কাল্পনিক বৃত্ত থেকে গল্প নেমে এসেছে সমস্যাদীর্ণ বাস্তবের জটিল ভূমিতে। অমলের শারীরিক অনুপস্থিতি সত্ত্বেও চারু ও ভূপতির দাম্পত্যের 'সুকঠিন মৌনে' অনুভূত হয়েছে অমলের অমোঘ অবস্থিতি। অন্যপক্ষে, "নানা দিক থেকে ঘা খাইয়া বিশ্বাসপরায়ণ" ভূপতি যখন গৃহমুখী হয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করেছে চারুর কাছে তখন সেই আশ্রয় অমলময় হয়ে গেছে, অধিকার করে রেখেছে চারুর মন ও সর্বস্ব চেতনালোক। ভূপতির এই প্রত্যাগমন, চারুলতাকে একান্ত করে পাওয়ার ইচ্ছেয় সাহিত্যচর্চায় নিজেকে নিমজ্জন সর্বৈব ব্যর্থ হয়ে গেছে। নিঃস্ব ভূপতির উপস্থিতি অলক্ষিতই থেকে গেছে তার স্ত্রীর কাছে। "একাগ্রচিত্তে অমলের ধ্যান" হয়ে উঠেছে চারুর জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব। রুদ্ধদ্বারে চারুলতা "উপুড় হইয়া পড়িয়া বালিশের উপর মুখ রাখিয়া বার বার করিয়া বলিত, 'অমল, অমল, অমল!' ...বলিত 'অমল, তোমাকে আমি একদিনও ভুলি নাই। একদিনও না, একদণ্ডও না। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পদার্থ সমস্ত তুমিই ফুটাইয়াছ, আমার জীবনের সারভাগ দিয়া প্রতিদিন তোমার পূজা করিব।"

চারুলতার এই নিবিড় অমল-যাপন ভূপতির অগোচরেই সাধিত হয়েছে। ফলস্বরূপ ষোড়শ ও সপ্তদশ পরিচ্ছেদে স্ত্রীকে আবিষ্কারের আশায়, চারুলতার সুখী দাম্পত্যযাপনের অভিনয়ে বিভ্রান্ত ভূপতি আনন্দিত হয়। অমলের প্রতি প্রেম ও ভূপতির প্রতি কর্তব্য সাধনের দ্বিখণ্ডিত সত্তায় চারুলতা থেকেছে অবিচল। এখানেই ভূপতি চরিত্রটির ট্যাজেডি। তাদের অসম দাম্পত্যের নীড় নষ্ট হয়ে গেছে, অথচ তা অজ্ঞাতে এবং অবলীলায় উভয়কে চালিত করেছে তীব্র গ্লানিময় পরিণতির দিকে। যদিও স্ত্রীর অমলের প্রতি এই একাত্ম নিবেদন স্বামীর অজানা থাকেনি। একটি টেলিগ্রামের মাধ্যমে তার আকস্মিক প্রকাশে ভূপতির স্ত্রীর প্রতি প্রেমাবেশের আতিশয্যজনিত ভ্রান্তি দূর হয়ে গিয়েছে।

সুতরাং, 'নষ্টনীড়' নেহাতই অসামাজিক প্রেমের অনিবার্য পরিণতির গল্প নয়। চারুলতা নেহাত বিশ্বাসঘাতিনী কিংবা অমলও নিছক পলাতক প্রেমিক নয়। চরিত্র-পাত্রর মনস্তাত্ত্বিক পরিণমন, তাদের অন্তর্নিহিত সংকট গল্পটিকে সামাজিকতার ঊর্ধ্বে অন্য একটি মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে এসে তাই দেখা যায়, ভূপতি বিশ্বাসভঙ্গের বেদনায় শুধু পীড়িত নয়, চারুলতার প্রতি সহমর্মিতায় ব্যথিত। ভূপতি উপলব্ধি করেছে, "এই-সমস্ত বঞ্চনা এ তো ছলনাকারীর হেয় ছলনামাত্র নহে; এই ছলনাগুলির জন্য ক্ষতহৃদয়ের ক্ষতযন্ত্রণা চতুর্গুণ বাড়াইয়া অভাগিনীকে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তের হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত নিষ্পেষণ করিয়া বাহির করিতে হইয়াছে।" বিংশ পরিচ্ছেদে এসে চারু ও ভূপতির পরস্পরের ছদ্ম দাম্পত্যের যে নীড় তা আন্তরিকভাবে রিক্ত হয়ে গেছে। নীড় ভেঙে ভূপতি ফিরে গেছে তার পুরনো পেশায়। বলেছে, "মানুষের যা-হোক-একটা-কিছু নেশা চাই।" সেই 'সম্পাদকি নেশা'-কে অবলম্বন করে ঘর ছেড়েছে ভূপতি। 'ভাঙা ইটকাঠ' স্বরূপ চারুলতাকে রেখে যেতে চেয়েছে 'অমলের বিচ্ছেদস্মৃতি' বেষ্টিত 'নষ্টনীড়'-এ। শেষপর্যন্ত ভূপতি সেই 'মৃতভার' রমণীকেই তার সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেও মুহূর্তের বিভ্রমকে অবসিত করে বিদ্ধ বিহঙ্গী চারু সেই বিড়ম্বিত নারীজীবন থেকে অব্যাহতি চেয়েছে। সে সংক্ষেপে উচ্চারণ করেছে, "না, থাক্।" এহেন সমাপ্তিতে সমাধানহীন, স্বামী-স্ত্রীর অনন্বয়ের প্রতিচ্ছবি হয়ে রয়ে গিয়েছে 'নষ্টনীড়'।

'নষ্টনীড়' ও 'ঠানদিদি' রচনার মধ্যবর্তী যে ব্যবধান সেই সময়পর্বে প্রকাশিত হয়েছিল আরেক নষ্ট দাম্পত্য ও সমাজ অসমর্থিত প্রেমের আখ্যান 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৫ এপ্রিল - ১৯১৬ ফেব্রুয়ারি, 'সবুজ পত্র')। রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসটি ভাষা-আঙ্গিকরীতি সবদিক থেকেই অভিনব। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তর 'ঠানদিদি' রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের প্রায় দুই বছর পর প্রকাশিত।

প্রথমত, যে বিষয়টি লক্ষণীয়, তা হল গল্পর নামকরণ। 'নষ্টনীড়' নামটি কোনও চরিত্র কিংবা ঘটনাকেন্দ্রিক নয়, ব্যঞ্জনাধর্মী। অন্যদিকে, নরেশচন্দ্র তাঁর গল্পর নামকরণের মধ্য দিয়ে গোড়াতেই পাঠককে ঈষৎ নাড়িয়ে দেন। গল্পটির নামকরণও চরিত্রকেন্দ্রিক– 'ঠানদিদি'। দ্বিতীয়ত, ঠানদিদি কিংবা ঠানদি সাধারণও মাতামহী কিংবা সেই স্থানীয় কোনও বয়স্কা মহিলার প্রতি প্রযুক্ত একটি কথ্য সম্বোধন। ফলত এই সম্বোধন-শীর্ষক শিরোনামটির কারণে সেটি যার প্রতি প্রযুক্ত সেই ব্যক্তি গল্পর মূল চরিত্র তা যেমন সহজেই অনুমেয়, তেমনই যে এই সম্বোধনটি করেছে তার প্রতিও একটি কৌতূহল সূচনাতেই তৈরি হয়ে যায় এবং তার উপস্থিতিও গল্পে অনিবার্য হয়ে ওঠে। গল্পে ঠানদিদি সম্বোধনকারী

সেই চরিত্রটি হল বিমলা। এখানেই গল্পকার দ্বিতীয় একটি ঝাঁকুনি কি পাঠককে দিতে চেয়েছেন? কারণ, এই বিমলা নামটির উল্লেখন-পূর্বে প্রকাশিত 'ঘরে-বাইরে'র বিমলাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে যার আত্মকথন পাঠকসমাজকে আন্দোলিত করেছিল। বিমলার ঠানদিদির গল্প উপস্থাপন করে কোথাও কি গল্পকার সামূহিক সম্পর্কগত জটিলতা ও রবীন্দ্রনাথ-কৃত তার দীর্ঘ মনস্তাত্ত্বিক উপস্থাপনকে ব্যঙ্গ করতে চেয়েছেন? এর স্পষ্ট কোনও ব্যাখ্যা না থাকলেও গল্পের পাঠগত বিশ্লেষণের সাহায্যে দুই গল্পকারের সমাজ অসমর্থিত প্রণয়ে সম্পর্কগত জটিলতার উপস্থাপনে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা কিংবা সাদৃশ্যকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব এবং তার সাপেক্ষে রবীন্দ্র-নরেশচন্দ্র বিরোধিতার মূলগত রূপটিকে অন্বেষণ করা যেতে পারে।

৫

'ঠানদিদি' গল্পটি 'নষ্টনীড়'-এর তুলনায় সংক্ষিপ্ত পরিসরে রূপায়িত একথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। গল্পটি চারটি পরিচ্ছেদে রচিত হলেও বস্তুত দুটি পর্বে এটি বিভাজিত। গল্পের প্রথম পর্ব অর্থাৎ প্রথম দুটি পরিচ্ছেদ বিমলার আত্মকথন। বিমলার উপস্থাপনায় ঠানদিদি চরিত্রটির রূপাবয়ব বর্ণিত হয়েছে এই পর্বে। গল্পের দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ অন্তিম দুটি পরিচ্ছেদ রচিত হয়েছে ঠানদিদি নাম্নী চরিত্রটির বাচনে। এই পর্বটির উপ-শিরোনাম 'ঠানদিদির কথা'। প্রসঙ্গত 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলির উপ-শিরোনাম (যেমন – বিমলার আত্মকথা) স্মরণীয়। এই প্রসঙ্গে 'নষ্টনীড়'-এর সঙ্গে 'ঠানদিদি'র মূলগত প্রভেদ হল, 'নষ্টনীড়'-এর কথক হলেন বহিঃস্থ সর্বজ্ঞ কথক। চারুলতা-অমল-ভূপতি-মন্দার কার্যকলাপকে তিনি ঈশ্বরের মতো নিরীক্ষণ করে তাদের অমোঘ নিয়তির দিকে অগ্রসর হতে দেখেছেন এবং প্রায় নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে তা বিবৃত করেছেন পাঠকের কাছে। কখনও কখনও তার সুগভীর বিশ্লেষণ কিংবা বিক্ষিপ্ত মন্তব্য ('হ্যাদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া', দশম পরিচ্ছেদ) গল্পের পাঠকৃতিতে স্থান করে নিয়েছে যা সময়বিশেষে পাঠকের চিন্তাকে অথবা তার মনোগত অভিপ্রায়কে বহিঃপ্রকাশে সহায়তা করেছে।

অন্যদিকে, 'ঠানদিদি' গল্পে নরেশচন্দ্র আত্মকথনরীতিকে অবলম্বন করায় কথক স্বভাবিকভাবেই হয়ে পড়ে অন্তঃস্থ। কথক গল্পের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কান্বিত হওয়ায় চরিত্রর স্বগত অভিপ্রায়টি গল্পে যেমন প্রত্যক্ষভাবে উঠে আসতে পারে, তেমনই পাঠকের কাছে তার অন্তর্গত বাসনার রূপটিও নগ্নভাবে উন্মোচিত হয়ে পড়ে। বাইরে থেকে কারও ব্যাখ্যা করার অবকাশ থাকে না। এক্ষেত্রে অন্তঃস্থ কথকের গুরুত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গির সাপেক্ষে বাকি চরিত্রগুলি ব্যাখ্যাত হয়। 'ঠানদিদি' গল্পে বিমলা চরিত্রটির মাধ্যমে গল্পকারের সেই সুযোগ থাকলেও তাকে বর্জন করে কার্যত গল্পটিকে সুতীক্ষ্ণ লক্ষ্যাভিমুখী করে তুলেছেন। ফলত, 'ঠানদিদি'র আয়তনিক পরিসরটির সংক্ষিপ্ততা হয়ে উঠেছে অবশ্যম্ভাবী।

গল্পের শিরোনামে যে চমক গল্পকার দিয়েছিলেন সূচনায় তাকে ভেঙে দিয়ে বিমলা বলেছে, "সকলে তাহাকে বলিত ঠানদিদি। তা'ছাড়া তাঁর যে অন্য নাম ছিল, তাহা কেহ জানিত কিনা সন্দেহ। ঠানদিদি বলিয়া তিনি বুড়ি ছিলেন না। বয়স তাহার বছর চল্লিশ, কিন্তু সমস্ত শরীরে তাঁর একটা নিটোল সৌষ্ঠব ছিল – যাহা দিন-রাত বয়সকে টিট্‌কারী দিত। তাঁর মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত একটা অপূর্ব্ব লাবণ্য ঢলঢল করিত, চক্ষে তাঁহার বিজলী খেলিত, অলঙ্কারহীন সহজ স্থির যৌবন তাঁহাকে যেন আগাগোড়া ছাইয়া শোভামণ্ডিত করিয়াছিল। তাঁহার সৌন্দর্য মিনমিনে ধরণের নয়, বেশ লম্বা-চওড়া, আগাগোড়া স্পষ্ট ও বৃহৎ, যেন গ্রেট অক্ষরে ছাপা একখানি অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থ।" গল্পর প্রথমেই ঠানদিদির রূপের বর্ণনায় তার প্রতি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের একটি দিক উন্মোচন করেছেন গল্পকার। অন্যদিকে, আমরা 'নষ্টনীড়'-এ চারুলতার সমতুল্য কোনও রূপবর্ণনা পাইনি। বরং একাদশ পরিচ্ছেদের শেষে চারু ও ভূপতির অমলের প্রতি পারস্পারিক সংলাপ থেকে অনুমান করা যায়, ঠানদিদির সমতুল্য রূপ সম্ভবত চারুর ছিল না। চারুর নিজেদের 'কালা আদমি' সম্বোধনের পরিপ্রেক্ষিতে ভূপতি বলে, "কালো রূপ ভোলবার জন্যেই তো সাত সমুদ্র পেরোনো। তা ভয় কী চারু, আমরা রইলুম, কালোর ভক্তের অভাব হবে না।" সুতরাং, বাহ্যত একটি বৈসাদৃশ্য দেখা যায় দুটি চরিত্রর মূলগত রূপাঙ্কনে।

ঠানদিদির কোনও নাম এই গল্পে স্পষ্টত উল্লিখিত হয়নি। যেহেতু তার আত্মগত বাচনে কাহিনি বিবৃত হয়েছে সেহেতু বাঙালি বিবাহিতা নারীর স্বধর্ম অনুসারে তার স্বামীর নাম অনুচ্চারিত থেকে গেছে। স্বামী ব্যতীত অপর যে

পুরুষকে কেন্দ্র করে ঠানদিদির জীবন আবর্তিত হয়েছে তার নাম শচীকান্ত। 'ঠানদিদি' গল্পটিতে ঠানদিদির যৌবনের প্রণয়কাহিনি ব্যক্ত হয়েছে। সুপুরুষ, বড় চাকুরিরত পঁচিশ বছর বয়সী স্বামী, উনিশ বছর বয়সী স্ত্রী ওরফে ঠানদিদি এবং একুশ-বাইশ বছরের দেবর শচীকান্তর অসংবৃত ত্রিকোণ প্রেম ও করুণ 'জীবন-কাহিনী'র নিগূঢ় সত্য উন্মোচন করেছে চল্লিশ বছর বয়সী ঠানদিদি স্বয়ং তার একান্ত অনুগতা বিমলার কাছে।

অমল-চারুলতার ন্যায় ঠানদিদি ও শচীকান্তও সম্পর্কে ভাজ-দেবর এবং তাৎপর্যপূর্ণভাবে ঠানদিদিরও পিসতুতো দেবর হল শচীকান্ত। অমল চারুলতা ও ভূপতির বয়সের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও, নরেশচন্দ্র গল্পের চরিত্র-পাত্রর বয়স ও ঘটনাক্রমের যাবতীয় তথ্য গল্পমধ্যে সন্নিবেশিত করেছেন। এবার আসা যাক, গল্পের সময় ও স্থান প্রসঙ্গে। 'নষ্টনীড়'-এ সুনির্দিষ্ট কোন সময়পর্ব জুড়ে গল্পের ঘটনাক্রম সংস্থাপিত তার বিশেষ উল্লেখ না থাকলেও 'ঠানদিদি' গল্পে দেখা যায়, উনিশ বছর বয়সে প্রকৃত ঘটনার সূত্রপাত এবং গল্পের সূচনায় ঠানদিদির বয়স চল্লিশ। অতএব, গল্পের অন্তর্বর্তী সময়কাল অনধিক একুশ বছর। যদিও এর দ্বিতীয় পর্বের ঘটনাক্রম অনধিক আট মাস। প্রথম পর্বের ঘটনা তার প্রায় কুড়ি বছর পর সংঘটিত হয়েছে, অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রথম পর্বের পর ফ্ল্যাশব্যাকে দ্বিতীয় পর্বটির উপস্থাপনা করা হয়েছে। অতীতের কোনও এক ঠানদিদি সম্পর্কিত তার বক্তব্যগুলি উপস্থাপন করেছে বিমলা। প্রতিতুলনায় দেখা যায়, 'নষ্টনীড়' গল্পে প্রতিটি ঘটনা সংঘটিত হয়ে তাকে পরিণামের দিকে অগ্রসর করে তুলেছে। অন্যদিকে, গল্পের প্রথম দুটি পরিচ্ছেদে ঘটনা সংঘটনের স্থান গ্রাম। গ্রামের নাম মীরপুর। বিশ বছর যাবৎ ঠানদিদি এই গ্রামের অধিবাসী, প্রতিবেশ বর্ণনাতেও গ্রাম্য নিয়মকানুন ও আচরণের আভাস পাওয়া যায়। গল্পের অন্তিম দুটি পরিচ্ছেদ তথা প্রকৃত ঘটনা সংঘটনের স্থান শহর, তবে সেটি কলকাতা নয়, মজঃফরপুর।

'নষ্টনীড়' গল্পে কলকাতার সাংস্কৃতির পরিমণ্ডলে স্থিত চারুলতার চরিত্রর একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল পাঠাভ্যাস, সাহিত্যচর্চা। অন্যদিকে, 'ঠানদিদি' গল্পে রূপ ব্যতীত তার অপর যে গুণাবলির পরিচয় পাওয়া যায় তা হল – ঠানদিদি রন্ধনপটিয়সী। বিশেষত মিষ্টান্ন ও নানা রকমের খাবার তৈরিতে তার সুখ্যাতি ছিল। বিমলার সূত্রে আমরা জানতে পারি, "আর ঠাকুরাণী যাহাতে হাত দিতেন, তাহাই শোভন সুন্দর অমৃত তুল্য হইয়া উঠিত। সকল রকম শিল্পে তাঁহার বিশেষ দখল ছিল বলিয়া বালিকা হইতে বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকলে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।" এছাড়াও "রোগে তাঁর মত সেবিকা গ্রামে কেন দেশে কোথাও ছিল না।" একইসঙ্গে ঠানদিদি ছিলেন "মিষ্টভাষিণী ও পরোপকারিণী।" স্বভাবতই তার কথাবার্তার লঘুত্বের ভিতর শান্ত মাধুরীর আভাসে, রহস্যালাপে বিমলা হয়ে পড়ে ঠানদিদির 'অন্ধ উপাসক'। অথচ বিধবা ঠানদিদি পান খেয়ে ঠোঁট রাঙাতেন, এমনকি "...হাসিয়া গাহিয়া রঙ্গরসে মাতিয়া বেড়াইতেন, তাহা বৈধব্যের সনাতন আদর্শের সঙ্গে মোটেই খাপ খাইত না।" আরও জানা যায় "অসতী বলিয়া তাঁর অপবাদ ছিল। ... কোনও দিন কোনও ঠাকুরের কাছে তাঁহাকে কেউ গড় হইতে দেখে নাই, নিজেও দীক্ষা লন নাই।" এই চরিত্রটি সম্পর্কে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে যখন বিমলার খোকা পানের থালা ফেলে দেয় এবং সহজ ক্রোধে বিমলার তাকে "মরণ হয় না, মুখপোড়া!" ইত্যাদি অভিসম্পাতের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ঠানদিদির শঙ্কিত আচরণের মধ্য দিয়ে। মনের অজ্ঞাতে উচ্চারিত কামনা কিংবা অভিসম্পাতের পরিণতিতে যে দুর্যোগ নেমে এসেছিল ঠানদিদির জীবনে তারই ফলস্বরূপ তার পূর্ব জীবনের কাহিনি ব্যক্ত হয়েছে। বস্তুত গল্পকার গল্পের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি বয়ন করেছেন ঠানদিদির জীবন-অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করার প্রাসঙ্গিকতাকে মর্যাদা দিতে। এই অংশটি গল্পটিকে যে নাটকীয় করে তুলেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রথম দুটি পরিচ্ছেদ জুড়ে ঠানদিদির ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক উন্মোচন করেছে বিমলা তার স্বগত বাচনে। তৃতীয় পরিচ্ছেদের সূচনায় দেখা যায়, যুবতী ঠানদিদি ও তার স্বামীর সম্মিলিত জীবনের মধুর চিত্র। উল্লেখ্য, চারুলতা ও ভূপতির মতো নতুনত্বের স্বাদ না পেয়েই তাদের দাম্পত্য পুরনো হয়ে যায়নি কিংবা উভয়ের দাম্পত্যজীবন যাপনে কোনও অচরিতার্থতা, অপূর্ণতার আভাস ছিল না। ঠানদিদি বলেছে, "স্বামী আমাকে যেমন ভালবাসিতেন, তেমন বুঝি কোনও স্বামী কখনও কোনও স্ত্রীকে বাসেনি। আমিও তাঁকে খুব ভালবাসিতাম। সারাদিনরাত্রি আমার সব কাজ, সব চিন্তা কেবল আমার স্বামীকে ঘিরিয়া থাকিত।" সুতরাং, চারুলতার মতো ঠানদিদির জীবন নিঃসঙ্গ, বিষণ্ণ ছিল না। ফলে তার জীবনে ভূপতির উপস্থিতি সত্ত্বেও অমলের আগমন ছিল অনিবার্য। অন্যদিকে, স্বামীর পদোন্নতিতে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে

পড়া স্বামীকে দিন-রাত কাছে না পাওয়াতে ঠানদিদি হয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ। একদা ঠানদিদির সমস্ত মনোযোগের কেন্দ্রস্থলে থাকা স্বামীর আকস্মিক অনুপস্থিতি এবং শচীকান্তর আগমন ঠানদিদি ও শচীকান্তর প্রণয়কে কতকটা যেন নিয়তি চালিত করে তুলেছে।

'নষ্টনীড়'-এ অমল ও চারুলতা খুনসুটি, খেলা, আবদার, পরস্পরের সান্নিধ্য উপভোগের মাধ্যমে ক্রমশ হয়ে ওঠে একে-অপরের নর্মসহচর এবং চারুলতার অপূর্ণ দাম্পত্য তাকে চালিত করে প্রণয়ের দিকে। গল্পসূত্রে আমরা দেখি, এই প্রণয় পারস্পারিক নয়, বরং একান্তভাবে চারুলতার। কিন্তু 'ঠানদিদি' গল্পে দেখা যায়, শচীকান্তর প্রথম দর্শনেই তার শরীরের সৌষ্ঠব, উজ্জ্বল চোখ, কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গিতে ঠানদিদির মনে সঞ্চারিত হয়েছে 'মিষ্ট মোহ'। ঠানদিদি জানায়, "শচীকান্ত হইল আমার অবসরের সঙ্গী, কর্ম্মে সহচর। দিন-রাত সে কাছে থাকিত, দিন-রাত তা'র মধুময় কথা শুনিতাম, শুনিয়া তৃপ্ত হইতাম না।" ফলত, শচীকান্ত ও ঠানদিদির সম্পর্ক নেহাত স্নেহ সম্বন্ধীয় দেবর-ভাজের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও সূচনা লগ্ন থেকে তারা ক্রমশ হয়ে পড়ে পরস্পরের অনুবর্তী। চারুলতা ও অমলের ন্যায় ঠানদিদি ও শচীকান্তর মধ্যে সম্পর্কের ক্রমিক উন্নতির চিত্র রচনা করেননি গল্পকার। শচীকান্ত আবির্ভাবের অনতিবিলম্বে সে হয়ে ওঠে ঠানদিদির শচী। অমল ও চারুর মধ্যেও এরূপ মধুর সম্ভাষণ থাকলেও অমল চরিত্রটির সঙ্গে শচীকান্তর প্রভেদ এই যে, লেখালেখি ও পড়াশোনার সুবাদে অমলের চারুলতা ছাড়াও একটি বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র ছিল, সেখানে তার অনুগত পাঠক-পাঠিকা, বন্ধু-বান্ধব, সমালোচকেরা ছাড়াও ছিল মন্দা। কিন্তু শচীকান্তর মজঃফরপুরে আগমন হাওয়া পরিবর্তন কল্পে। সুতরাং, বৃহৎ কর্মজগৎ থেকে শচীকান্ত ছিল আপাত বিচ্যুত যা তাকে ঠানদিদির প্রতি আরও একনিষ্ঠ করে তুলতে সহায়ক হয়েছে। এছাড়াও এই গল্পে শচীকান্ত ও ঠানদিদির মধ্যে কোনও তৃতীয় নারীর আগমন ঘটে তাদের প্রণয়কে কণ্টকিত অথবা বিলম্বিত করেনি। ফলত গল্প হয়ে উঠেছে দ্রুত পরিণামমুখী।

ঠানদিদির স্বামী মাথা ধরা জনিত অসুস্থতা নিয়ে বাড়ি ফিরলেও স্বভাবতই ঠানদিদির কাছে তা শচীকান্তর অপেক্ষা গুরুত্ব পায়নি। ভূপতির সঙ্গে ঠানদিদির স্বামী চরিত্রটি নির্মাণের গঠনগত ভিন্নতা এই যে, চারু ও অমলের ঘনিষ্ঠতা ভূপতির চোখে ছিল নিছক নির্দোষ রসালাপ ও স্নেহ সম্বন্ধীয়। ভূপতি অমলের উপর চারুকে পড়ানোর ভার দিয়ে নিজের অজ্ঞাতেই চারুকে অমলের প্রতি উন্মুখ করে তুলতে সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু ঠানদিদির স্বামী প্রথমাবধিই অতিমাত্রায় সজাগ ও সচেতন। নীলকর ডেভিড সাহেবকে ইঙ্গিত করে ঠানদিদিকে 'সতি' নামে সম্বোধন কিংবা শচী ও ঠানদিদির নিরীহ আলাপে বিরক্তির আভাসে তা অনুমান করা যায়। এই 'বিরক্তির চিহ্ন' যে ঠানদিদির অলক্ষ্যে থেকে গেছে এমন নয়, ঠানদিদি বলে, "আমি বুঝিলাম, আমার মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল, বুকের ভিতর কাঁপিতে লাগিল।" ঠানদিদির মনে শচীকান্তর প্রতি যে অদম্য আকর্ষণ বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় তারই অনাবৃত হয়ে পড়ায় ঠানদিদি লজ্জিত হয়েছে। 'লাল' শব্দটির ব্যবহার এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। গল্পকার বিভিন্ন প্রসঙ্গে গল্পে এছাড়া প্রায় চারবার এই শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। যেমন –

> ক. "শচীকান্ত একাগ্রচিত্তে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। আমার কান পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল, আমি লজ্জিত নববধূর মতো ঈষত ঈষৎ হাসিয়া চলিয়া গেলাম।"
>
> খ. "স্বামী হাসিয়া বলিলেন, "সে খবর নেবার তো অবসর হয়নি, দেওরটি নিয়েই ব্যস্ত আছ।" ... এ কথায় আমি অসম্ভব লাল হইয়া উঠিলাম, পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ভিতরে ভিতরে কাঁপিতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ যেন ঘামিয়া উঠিল। ডেভিড সাহেবের কথায় তো কখনও এমন হয় নাই।"
>
> গ. "এই রকম অবস্থায় স্বামী আমাদের দেখিলেই দু'জনেই যেন কেমনতর হইয়া যাইতাম – মুখ, চোখ, কান লাল হইয়া উঠিত, হয় তো এমন একটা কথা, এমন একটা অযাচিত ব্যাখ্যা দিতাম, যাহাতে সন্দেহ বাড়িত বই কমিত না।"
>
> ঘ. "আমি মুখ তুলিয়া বলিলাম, "শচীকান্ত! তুমি আমাকে ভালবাস?" শচীকান্তের সমস্ত শরীর হঠাৎ একবার কাঁপিয়া উঠিল। সে একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেল, পর-মুহূর্ত্তে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে মাটীর দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।"

সমাজ বিগর্হিত প্রেমের গোপন অভিসারসঞ্জাত কামনা-বাসনার নিরাবরণ রূপটি মুখমণ্ডলের অলক্তরাগের ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়েছে। 'লাল' শব্দটির মাধ্যমে লেখক সেই অনাকাঙ্ক্ষিত সত্য প্রকাশের অভিব্যঞ্জনাকে ভাষারূপ দিয়েছেন।

এই সত্য উন্মোচনের ব্যঞ্জনায় 'লাল' শব্দটির ব্যবহার দেখা যায় 'নষ্টনীড়'-এও। গল্পের একাদশ পরিচ্ছেদে ভূপতি অমলের বিবাহ প্রস্তাবের কথা বলায়, অসচেতন চারু বলে ওঠে, "কেন, আমাকে কি পছন্দ হল না।" মনোগত একান্ত উদ্বেগের এই অমোঘ বহিঃপ্রকাশে চারুলতার 'মুখ লাল' হয়ে উঠেছে। কিংবা ভূপতি নিছক রসিকতায় অমলের ভাবী স্ত্রীর প্রতি চারুর হিংসের কথা বললে, কথক জানান, "চারু এই কথায় লাল হইয়া উঠিয়া কোলাহল করিয়া বলিতে লাগিল, "হিংসে! তা বৈকি! কখ্খনো আমার হিংসে হয় না। ওরকম ক'রে বলা তোমার ভারি অন্যায়।" এছাড়া শচীকান্তর ন্যায় অমলেরও 'কর্ণমূল লোহিত' হয়ে গেছে তার ও চারুলতার সম্পর্কের ভাবনায়। কঠিন ও অনাকাঙ্ক্ষিত সত্যের অনির্দেশ্য প্রকাশে সংকুচিত হয়ে উঠেছে চারুলতা, ঠানদিদি, অমল, শচীকান্তরা। সম্পর্কের দোলাচলতায় আন্দোলিত হয়েছে তারা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে স্বামী ও শচীকান্ত উভয়কে কেন্দ্র করে ঠানদিদির মনের যে টানাপোড়েন দেখা যায় গল্পের চতুর্থ পরিচ্ছেদের সূচনাতে তা প্রবল আকার ধারণ করেছে। ঠানদিদি বলে, "রাত্রে শুইয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। ... আমি একটা প্রবল স্রোতে ভাসিয়া ছুটিয়াছি – এই শচীকান্তের দিকে।" ভূপতির মতো ঠানদিদির স্বামীও সাময়িকভাবে স্ত্রীর একনিষ্ঠতায় আশ্বস্ত হয়ে বিভ্রান্ত হয়েছে। অন্যদিকে, ঠানদিদির অকপট স্বীকারোক্তিতে ফুটে উঠেছে স্বামীর প্রতি প্রবল অনীহা। সে বলেছে, "আমার স্বামীর নিকট হইতে আমার মন যে কখন অলক্ষিতে সরিয়া গেল, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না, ... যতক্ষণ তাঁহার কাছে থাকিতে হইত, ততক্ষণ যেন একটা বোঝা ঘাড়ে চাপিয়া থাকিত; ... মাঝে-মাঝে এমন কি, তাঁকে একটা আপদ্ বলিয়া মনে হইত। ... মনটা যেন বিষ হইয়া উঠিত, মনে হইত, আপদ্ গেলে বাঁচি।" স্বামীর প্রতি বিমুখ ঠানদিদি ক্রমশ তার বিরোধী হয়ে উঠেছে। যেহেতু এই প্রণয় অবাঞ্ছিত, সামাজিক নীতি লঙ্ঘনের দোষে দুষ্ট, কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ঠানদিদি বলেছে, "দোষ আমার শরীর স্পর্শ করে নাই, কিন্তু আমার অন্তর যে স্বামীর নিকট সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী এবং শচীকান্তর প্রতি অনুরক্ত, এ কথা তখন ভাল করিয়া স্বীকার করিতে চাহিতাম না।" শচীকান্তর দেহ-সৌষ্ঠবের বর্ণনা ও তার প্রতি আকর্ষণ থাকলেও ঠানদিদি তা অস্বীকার করতে চেয়েছে। এবং গল্পকারও ঠানদিদিকে কিছুটা নৈতিক সমর্থন দিতে ঠানদিদির পরিণতিকে ট্র্যাজিক করে তুলেছেন।

ঠানদিদি ও শচীর দেহলগ্ন অথচ নিরীহ কিছু মুহূর্ত এমন কাকতালীয়ভাবে ঠানদিদির স্বামীর সম্মুখে ঘটে গেছে যে, ঠানদিদির পীড়িত স্বামীর 'অভিযোগপূর্ণ দৃষ্টি' বিদ্ধ করেছে ঠানদিদিকে। পক্ষান্তরে, আপাত নিরীহ ঠানদিদির 'হৃদয়' হয়ে উঠেছে 'বিদ্রোহী'। এরইমধ্যে ঠানদিদি এই ত্রিকোণ সম্পর্কের নিহিত সত্যটিকে প্রকাশ করে বলেছে, "... আমরা তিনজনেই পরস্পরের মনের ভাব খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু যেন বুঝি নাই, এমনি ভাণ করিয়া সবাই সবার সঙ্গে লুকোচুরী খেলিতেছিলাম – তাই আমাদের এই বিপত্তি।" 'নষ্টনীড়' গল্পে অমল চারুলতার এই মনের ভাব বোঝামাত্রই তার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে শচীকান্ত তা করেনি বরং ঠানদিদির স্বামীর শচীকান্তকে কলকাতায় গিয়ে পড়াশোনা করার পরামর্শে সে কিছুটা বিব্রত ও উত্তপ্ত হয়েছে।

এছাড়াও, চারু ও ভূপতির মধ্যে পরস্পরের সহানুভূতিশীলতার যে সম্বন্ধ 'নষ্টনীড়'-এ তা কখনই বিদ্বেষের পর্যায়ে পৌঁছায়নি।

> "ছবিতে ওয়াশের কাজের মতো লেখক কিন্তু সব চড়া রঙ ধুয়ে দিয়েছেন – আভাসটুকু শুধু আছে।"[২৭]

চারু ভূপতির প্রতি বঞ্চনায় দুঃখিত হয়েছে এবং সর্বোপরি ভূপতির প্রত্যাগমনকে প্রত্যাখ্যান করে সে হয়ে উঠেছে নির্লিপ্ত, শোকসন্তপ্ত এক উপাসিকা। কিন্তু এই গল্পে ঠানদিদির চরিত্রটি সমাহিত প্রকৃতির নয়, শচীকান্তর উপস্থিতি তাকে করে তুলেছে দুর্দমনীয় ও দূরাকাঙ্ক্ষী। ফলে, "বৈধব্যের কল্পনাও প্রীতিকর বোধ হইল। ... শচীকান্ত সেই পতিবিহীন জীবনের সহিত বিজড়িত হইয়া গেল। বিধবাবিবাহ, দেবরের সহিত পরিণয় প্রভৃতি কত কল্পনা আমার যেন সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে মনের উপর দিয়া ছবির মতো ভাসিয়া গেল –" ইত্যাদি স্বপ্ন-কল্পনায় ঠানদিদি নিজেকে নিমজ্জিত

করেছে। চারুলতার সঙ্গে তার প্রভেদ এই যে, চারুলতার কল্পনা এত বেশি দূরতিক্রম হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু নাটকীয়তা ও চড়া দাগের উত্তেজনায় পূর্ণ এই গল্পে ঠানদিদির এই দুর্দান্ত কামনা অচিরেই পূরণের পথে অগ্রসর হয়েছে। তিনদিনের মধ্যে মস্তিষ্কের জড়তায় মৃত্যু হয়েছে ঠানদিদির স্বামীর। 'নষ্টনীড়' গল্পে প্রেমিক অমল পলাতক হয়ে সমাজনীতির বাহ্যিক সৌসাম্য রক্ষা করেছে। রবীন্দ্রনাথের এই সীমাবদ্ধতাকে ভেঙে আরও অগ্রবর্তী হয়ে নরেশচন্দ্র প্রেমিককে পলাতক তো করেননি বরং স্বামীর মৃত্যু ঘটিয়ে ঠানদিদি চরিত্রটিকে মনস্তাত্ত্বিক সংকটভূমি থেকে নিয়ে এসেছেন সমাজবাস্তবতার শক্ত মাটিতে।

স্বামীর মৃত্যু পরবর্তী ছয় মাস সময়কালে শচীকান্তর সেবা-শুশ্রূষায় ঠানদিদির একান্ত যাপনে তাদের পারস্পরিক প্রেম পত্রে-পুষ্পে পল্লবিত হয়ে উঠেছে। স্বামীর মৃত্যুজনিত গ্লানির সঙ্গে উপর্যুপরি তার জীবনবিমা থেকে প্রাপ্ত পঞ্চাশ হাজার টাকা আকস্মিক প্রাপ্তিতে ঠানদিদির বিবেকবোধ জাগ্রত হয়ে উঠেছে। শচীকান্ত ও ঠানদিদির যে প্রেম পরিণতি পেতে পারত তা ঠানদিদির প্রত্যাখানে অপূর্ণ থেকে গেছে। অন্যদিকে, শচীকান্তকেও বিদায় নিতে হয়েছে এই অপূর্ণতাকে অংশ করে। একটি চিঠির মধ্য দিয়ে ঠানদিদির প্রতি শচীকান্তর মনের ভাব ব্যক্ত হয়েছে। সে জানিয়েছে, "... এত দিন সে যেমন নীরবে প্রত্যক্ষ প্রেম প্রতিমার গোপন পূজা করিয়া আসিয়াছে, চিরদিন সে তেমনই করিবে।" প্রসঙ্গত, ঠানদিদি পুনরায় স্বামীর প্রতি অনুগত হয়েছে এমন কোনও অস্বাভাবিক পর্যায় গল্পে আনেননি। শচীকান্তর চিঠি বুকে করে রেখে অতঃপর সেই 'রত্নে' তার অধিকার নেই বিবেচনা করে তাকে ভস্মসাৎ করেছে ঠানদিদি। কিন্তু সে স্বীকার করেছে, "আজ পর্য্যন্ত আমি শচীকান্তকে ভুলিতে পারি নাই। আজও তার স্মৃতি আমার বৃদ্ধ হৃদয়কে সরস করিয়া তুলে। অনেক চেষ্টা করিয়াও এখন পর্য্যন্ত স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী রহিয়া গিয়াছি।" এর মধ্য দিয়ে ঠানদিদির বৈধব্যের সনাতন আদর্শের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ ও বিমলার নিজ সন্তানকে অভিসম্পাতের ফলশ্রুতিতে ঠানদিদির অনর্থক আশঙ্কার কারণ উন্মোচিত হয়েছে। গল্পকার ঠানদিদি চরিত্রটিকে মহত্তর ব্যঞ্জনায় ব্যঞ্জিত করলেও তাকে বাস্তব-বিচ্যুত করেননি।

'নষ্টনীড়' ও 'ঠানদিদি' গল্পদুটির পাঠগত বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্টত বোঝা যায়, এদের মধ্যে সাদৃশ্য সুপ্রচুর হলেও অন্তর্নিহিত ভাবের বৈসাদৃশ্যও কম নয়। সমাজ অসমর্থিত প্রেমের মনস্তত্ত্বসম্মত যে রূপায়ণ রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন তা তাঁর সমকালে যথাযথভাবে মূল্যায়িত হয়নি, এমনকি পরবর্তীকালেও অনেক ক্ষেত্রে তার অক্ষম অনুসরণ কিংবা অপব্যাখ্যা হয়েছে। যেমন– 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' গ্রন্থে 'নষ্টনীড়'-এর বিস্তারিত সমালোচনা-পূর্বক যতীন্দ্রমোহন সিংহ লিখেছেন,

> "আমাদের হিন্দুর গৃহে দেবর ভ্রাতৃবধূ সম্বন্ধটা বড়ই মধুর সম্বন্ধ, স্বামীর ছোট ভাইকে স্ত্রী নিজের ভাইয়ের মতই যত্ন করিয়া থাকেন এবং রহস্যালাপের মধ্যে তাঁহাদের পরস্পর-স্নেহ জমিয়া উঠে। বলা বাহুল্য, সেই স্নেহ পবিত্র, তাহাতে কিছুমাত্র মলিনতা নাই। কবিবর রবীন্দ্রনাথই প্রথমে সেই পবিত্র স্নেহের কিরূপ অপব্যবহার হইতে পারে তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। ... এই সকল, সাহিত্য-সমাজ-শরীরে বিষের ন্যায় কার্য্য করিতেছে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"[২৮]

এরসঙ্গেই বলা হল,

> "কবিবর রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস এই 'নষ্ট-নীড়ে'র রাজকীয় সংস্করণ (royal edition)।"[২৯]

এই জাতীয় সমালোচনার উৎসাহেই মূলত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের প্রেক্ষিতে তাঁর সাহিত্যকে সংলগ্ন করে দেখার উৎসাহেই 'নষ্টনীড়' বারবার এসেছে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। কবিমানসীকার লিখেছেন,

> " 'নষ্টনীড়ে' অমলের কৈশোরলীলা। 'ডাকঘরে'র শিশু অমলের মতই 'নষ্টনীড়ে'র কিশোর অমলকে কবি নিজের আদলে গড়েছেন বলে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না।"[৩০]

আবার, আরেক সমালোচক লিখেছেন,

> "...সম্পাদক ভূপতির জীবনট্রাজেডি বহুবিখ্যাত নষ্টনীড় গল্পে। বৈশাখে গল্পের ভূপতিও নতুন কাগজ বের করল সম্পাদকরূপে; অপর দিকে গল্পের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ নিজেও নতুন কাগজ প্রকাশ করলেন

> সম্পাদকের ভূমিকায়। একই সময়ে একই কর্মসাধনায় নিয়োজন ঘটল উভয়ের – গল্পের চরিত্র এবং গল্পকারের।"[৩১]

একদিকে, কাদম্বরী-রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের রসায়নকে চারুলতা-অমলের মধ্যে দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টায়, বিশেষত কাদম্বরীর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে যাবতীয় বিতর্কের উত্তরস্বরূপ অমল চরিত্রটির নির্মাণ, তার সারল্য ও পবিত্রতাকে গল্পকারের কৈফিয়ত বলে মনে করলেন সমালোচকেরা। অন্যদিকে, 'নষ্টনীড়' রচনাকালে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের প্রতি একপাক্ষিক দৃষ্টি রেখে নব পর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথকে ভূপতি এবং যথাক্রমে স্ত্রী মৃণালিনীকে চারুলতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথকে অমলের ভূমিকায় অবতীর্ণ করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-চর্চার ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে এ-সমস্ত অনুমান নির্ভর ব্যাখ্যা কিংবা জীবনীমূলক সমালোচনা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক এমন নয়; কিন্তু এর ফলে যে সমস্যাটি তৈরি হয় তা হল– নিছক সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের মধ্যেই বিষয়টি সীমাবদ্ধ থেকে যায় এবং এই কষ্টকল্পিত সাদৃশ্য কিংবা বৈসাদৃশ্য কোথাও গল্পের শৈল্পিক দিকটিকে প্রচ্ছন্ন রেখে দেয়।

যে-কারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালে সাহিত্যে যে আধুনিকতা এনেছিলেন শুধুমাত্র তার বিষয়গত দিকটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অনুসারী সাহিত্যিকরা সাহিত্যসৃষ্টি করে গেছেন। ফলে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সহ পরবর্তী সাহিত্যিকদের রচনায় যৌনতার বহিঃপ্রকাশকে যখন 'ল্যাঙট-পরা গুলি-পাকানো ধূলো-মাখা আধুনিকতা'র 'ধার করা নকল নির্লজ্জতা' বলে অভিহিত করেছেন তখন তিনি সমালোচিত হয়েছেন। 'উত্তরা' পত্রিকার আশ্বিন ১৩৩৪ সংখ্যায় জনৈক 'শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় – কাশী' 'সাহিত্য-ধর্ম্ম' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে লিখেছেন,

> " 'নষ্ট-নীড়ে'র যে ব্যাপারটি তাহাই বা কোন্ পদ্মফুলের সৃষ্টি করিল তাহাও তো বুঝিতে পারা যায় না! বিজ্ঞানের দোহাই বা সাধারণ সত্যের দোহাই তো রবীন্দ্রনাথ দিতে পারেন না। তবে দেবরের প্রতি চারুর এই তন্ময়তা সৃষ্টির দ্বারা রসবোধের কোন্ চরম উৎকর্ষ দেখানো হইল, রসের ক্ষেত্রের কোন্ আভিজাত্য ফুটিল তাহাও তো বুঝিবার উপায় রহিল না!"[৩২]

এবং তাঁদের প্রায় সম্মিলিত ব্যাখ্যায়,

> "...রবীন্দ্রনাথই আধুনিক সাহিত্যের নূতন পথের দিকে নবীনকে তাহার পুচ্ছটিকে আস্ফালন করিতে করিতে অগ্রসর হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যেখানে রুচিবাধাগ্রস্ত হইয়া লেখনীকে নিরস্ত করিয়াছেন, অতি-আধুনিক সেখানে রুচির বাধাকে অবহেলা করিয়া সত্যের সমগ্রতাকে অব্যাহত রাখিবার জন্যই লেখনীকে স্বাধীন ও বহুস্থলে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া দিয়াছেন।"[৩৩]

এই ব্যাখ্যাকে স্বীকার করলে স্বাভাবিকভাবেই 'ঠানদিদি' গল্পটিকে মনে হবে 'নষ্টনীড়'-এর গাল্পিক জবাব। একইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লেখনী অশ্লীল না হলে সে বিষয়ীভূত একই লেখাকে অশ্লীল বলে আখ্যায় আখ্যায়িত করা যাবে না এই যুক্তিও প্রচল হয়ে যায়। তার বাস্তব প্রমাণ 'নষ্টনীড়' কিংবা 'ঠানদিদি' রচনার বহুবছর পর জনৈক লেখক নায়ক ও তার কাকিমার শারীরিক সম্বন্ধের এক গল্প রচনা করে আনন্দবাজারের দপ্তরে পাঠান এবং তা 'কুরুচিকর' বিবেচনায় বিমল কর ফেরত পাঠালে লেখক শুধু কাকিমার পরিবর্তে বৌদি করে এনে যুক্তিস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়'-এর কথা তুলে ধরেন।

কিন্তু বিষয়গত আধুনিকতার প্রতি গুরুত্ব দিতে গিয়ে যে বিষয়টি প্রায় অগ্রাহ্য থেকে যায় তা হল, এই 'নষ্টনীড়' গল্পটি রবীন্দ্র-ছোটগল্পের দ্বিতীয় পর্বের সূচনাকারী। যে পর্বের গল্পগুলিকে তিনি অভিহিত করেছেন পরবর্তী বা 'later' পর্যায়ের গল্প হিসেবে। যেখানে অগ্রবর্তী পর্যায়ের গল্পের 'freshness' কিংবা 'tenderness' পাওয়া যাবে না। পর্বের গল্পে দেখা যায় 'technique', 'psychological value', 'problems'-এর আধিক্য। স্বভাবতই চারুলতা-অমল-ভূপতির সম্পর্ক খুব সহজ আঙ্কিক গতিতে এগোয়নি। নানা মানসিক টানাপোড়েন, সমস্যা, 'ঘটনাগত প্রবল গতিবেগের চাপ বা আততি' নিয়ে গল্পটি গড়ে উঠেছে। বস্তুত,

> "এই অগ্রবর্তী ও পরবর্তীর ফারাক উনিশ ও বিশ শতকের ধ্যানধারণার ব্যবধান – যা ব্যক্তিগত ও বিশ্বগত।"[৩৪]

ফলত, গ্রামজীবন ও পদ্মাসঙ্গবিচ্যুত তাঁর মন সময়ের দাবীতেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে মানুষের দ্বন্দ্ব-জটিল সম্পর্কের রসায়নে। পূর্বে যুক্তিকে বিস্তার দিয়ে বলা যেতে পারে, ঠিক যেভাবে সময়ের অনিবার্যতায় প্রাচীনপন্থী 'নারায়ণ' পত্রিকা প্রকাশ করেছে 'ঠানদিদি'র মতো গল্প। প্রকাশিত হয়েছে 'ডালিম', 'কমলের দুঃখ', 'মরণে জয়', 'আঁধার ঘরে', 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা'র মতো দুঃসাহসিক লেখা কিংবা 'ভারতী'র মতো ঐতিহ্যশালী ও রুচিশীল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তর 'শুভা', 'পাপের ছাপ'-এর মতো যৌন-আবেদনমূলক উপন্যাসের সপ্রশংস সমালোচনা।

রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব হল তিনি শুধু বিষয়গত আধুনিকতায় কিংবা আধুনিকতার ধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি; তাঁর শৈল্পিক সামর্থ্য 'নষ্টনীড়' রূপায়ণের মাধ্যমে তাকে সার্থক করে তুলেছে। অন্যদিকে, দুঃসাহসিক বিষয় নির্বাচনের মধ্যেই তথাকথিত আধুনিক লেখকগণ সীমাবদ্ধ থেকে গেছেন। যৌনতা শিল্পাস্বাদে যেখানে সহায়ক হয়েছে সেই রচনা বারবার পঠিত হয়েছে। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তর ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-জনিত অস্থিরতার ছাপ দেখা যায় নরেশচন্দ্রর লেখনীর মধ্যে। এছাড়াও, তাঁর সাহিত্যে ফ্রয়েড ও হ্যাভলক এলিসের প্রভাবও লক্ষ করেছেন বহু বিদগ্ধ সমালোচক।

> "নরেশচন্দ্র নরনারীর অবচেতনায় এই যৌন প্রবৃত্তির দিকে বিশেষ প্রবণতাকে একান্ত বাস্তব ব'লে স্বীকার করেছেন। শুধু তাই নয়, মানুষের যৌনচেতনার সঙ্গে অপরাধ প্রবণতার মিশ্রণ ঘটিয়ে নরেশচন্দ্র বাঙলা কথাসাহিত্যে এক অভিনব দিক্ নির্দেশ করেছেন।"[৩৫]

এই সমস্ত সময়গত প্রবণতাকে সঙ্গে নিয়ে 'ঠানদিদি' যে 'নষ্টনীড়'-এর গাল্পিক অগ্রগমন কিংবা তার বিজ্ঞানসম্মত রূপায়ণ প্রচেষ্টা সে-বিষয়ে সংশয় নেই। কিন্তু বিজ্ঞান অতিরিক্ত যে শিল্পগত ব্যঞ্জনা, সেখানে রবীন্দ্রনাথ যে মাত্রায় 'নষ্টনীড়'কে নিয়ে গেছেন 'ঠানদিদি' সেই উচ্চতাকে স্পর্শ করতে পারেনি। সুতরাং, দুই ভিন্নধর্মী লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিগত বিভিন্নতার নির্দশন হিসেবে 'নষ্টনীড়'-এর প্রাসঙ্গিক আলোচনায় 'ঠানদিদি' গল্পটির উপস্থিতিই তাকে করে তুলেছে ঐতিহাসিক ও অমূল্য।

তথ্যসূত্র :

১. তৎকালীন সাতজন উদীয়মান রবীন্দ্রানুসারী সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে যে ছবি তুলেছিলেন, উক্ত শব্দবন্ধটি সেই ছবির শিরোনাম ছিল। প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য নীরদচন্দ্র চৌধুরী, দ্বিতীয় অধ্যায় : রবীন্দ্রনাথের নিন্দা ও নিন্দাকারীরা, তৃতীয় ভাগ : অপরাহ্ণ, আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ (অখণ্ড সংস্করণ), প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৪১৫, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ২০৮
২. পাল, শ্রাবণী, 'স্ত্রীর পত্র' ও 'মৃণালের কথা' দুই বিপরীত পাঠ, রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রের দূত, অক্ষর প্রকাশনী, ৩২ বিডন রো, কলকাতা - ৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০১০, পৃ. ১২৪
৩. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, নবম অধ্যায় : জটিল জীবন-সমস্যা, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭০০০৭৩, চতুর্থ সংস্করণ : মাঘ ১৪২৪, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ২১৬
৪. 'কল্লোল' পর্বের অন্যতম সাহিত্যিক ও 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থ প্রণেতা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর একদা বিতর্কিত গ্রন্থ 'বেদে' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ৩১ আশ্বিন ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে অচিন্ত্যকুমারকে লেখা একটি পত্রে উক্ত মন্তব্যটি করেন।
৫. সজনীকান্ত দাস লিখেছেন, "নূতন বৎসরের গোড়া হইতে জল-'কল্লোল' হঠাৎ যৌন-কল্লোল হইবার সাধনায় মাতিল।" দ্রষ্টব্য সজনীকান্ত দাস, আত্মস্মৃতি, নাথ পাবলিশিং, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম নাথ পাবলিশিং সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ১১২
৬. 'সাহিত্য' পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের একটি অংশ যেখানে বৈষ্ণববেশধারিণী শান্তি ইংরেজ 'এনসাইন' লিন্ডলির সঙ্গে ঘোড়ায় যেতে স্বীকৃত হয়ে লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসেছিলেন – 'বে-

সেলাই' কাপড় পরে শান্তির লাফ দেওয়ায় ঘটনাটিকে নির্দিষ্ট করে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে শালীনতা ভঙ্গের অভিযোগ করেছেন। এই প্রসঙ্গটির উল্লেখ পাওয়া যায় নীরদচন্দ্র চৌধুরীর আত্মঘাতী বাঙালী (দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড) বইয়ে। নীরদচন্দ্র চৌধুরী, দ্বিতীয় অধ্যায় : রবীন্দ্রনাথের নিন্দা ও নিন্দাকারীরা, তৃতীয় ভাগ : অপরাহ্ণ, আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ (অখণ্ড সংস্করণ), প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৪১৫, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, পৃ. ২০৭

৭. ভট্টাচার্য, জগদীশ, কবিমানসী (প্রথম খণ্ড : জীবনভাষ্য), ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৯, পৃ. ৯১

৮. দাস, সুনীল, ভারতী ইতিহাস ও রচনাপঞ্জী, সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশ : কার্তিক ১৩৯১, অক্টোবর ১৯৮৪, পৃ. ২

৯. রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড, গ্রন্থপরিচয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মহাকরণ, কলকাতা - ৭০০০০১, প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ, ১৪০৮

১০. রায়, নীহাররঞ্জন, রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা, নিউ এজ পাবলিশার্স, ৮/১ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ, ১৩৪৮, পৃ. ৩৯৯

১১. তদেব

১২. দাস, সজনীকান্ত, আত্মস্মৃতি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮

১৩. তদেব, পৃ. ১১৪

১৪. তদেব, পৃ. ১১৫

১৫. রবীন্দ্রনাথকে লিখিত সজনীকান্ত দাসের পত্রাবলী, পত্রসংখ্যা : ১ (৭ মার্চ, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ), চিঠিপত্র, ঊনবিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ, ১৪১১, পৃ. ৬৫

১৬. চৌধুরী, ভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬২, পৃ. ৩০৫

১৭. রবীন্দ্রনাথকে লেখা সজনীকান্ত দাসের পত্রাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪

১৮. দাস, সজনীকান্ত, মধু ও হুল, রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস, ২৫/২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ : ১৩৩৮, পৃ. ২০৮

১৯. সজনীকান্ত, দাসকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১-২

২০. এই চিঠিটি উদ্ধার করে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মন্তব্য করেছেন, "রসিকতাটা বুঝতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই সরাসরি খারিজ করে দিলেন আর্জি।" কল্লোল যুগ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৫৭, পৃ. ১১৭

২১. সেনগুপ্ত, নরেশচন্দ্র, সাহিত্যধর্ম্মের সীমানা, শ্লীলতা-অশ্লীলতা ও রবীন্দ্রনাথ, কারিগর, ৩৫ বি, ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা - ৭০০০০৪, কারিগর সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৮৪

২২. ভট্টাচার্য, গৌতম, শ্লীলতা-অশ্লীলতা ও রবীন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭১

২৩. তদেব, পৃ. ৮৭

২৪. তদেব, পৃ. ২৬৮

২৫. তদেব

২৬. বসু, জ্যোতিপ্রসাদ, (সম্পাদিত), গল্প-লেখার গল্প, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ, ১৩৫৩, পৃ. ৩

২৭. গুপ্ত, ক্ষেত্র, রবীন্দ্র-গল্প : অন্য রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা - ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৯১,

পৃ. ১৮৩
২৮. সিংহ, যতীন্দ্রমোহন, সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা [বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের গতি নির্ণয় ও সমালোচনা], ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, কলিকাতা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ, ১৩২৮, পৃ. ৭৩-৭৪
২৯. তদেব, পৃ. ৭৫
৩০. ভট্টাচার্য, জগদীশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬
৩১. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, রবীন্দ্রনাথ যখন সম্পাদক : বঙ্গদর্শন, রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ৬২
৩২. ভট্টাচার্য, গৌতম, পৃ. ২৫৭
৩৩. রায়, শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র, কাশী, সাহিত্য-ধর্ম্ম, উত্তরা, আশ্বিন ১৩৩৪, গৌতম ভট্টাচার্য, তদেব
৩৪. শাশমল, অতনু, EARLIER STORIES AND LATER STORIES, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে, সপ্তর্ষি প্রকাশন, ৬৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃ. ২৬
৩৫. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৮